বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৩ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বিজয়: ইতিবৃত্ত ও মর্মার্থ

বিজয় অর্জনের গৌরবগাথা

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় হত্যা করা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বোতল/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ায় ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০২৩ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ, বিজয় সরণি, ঢাকা

সম্পাদকীয়

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে এই দিনে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করে– প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। যে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান থেকে ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার সৈন্যসহ পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের ঘটনা এটাই প্রথম। বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা, শহিদ বুদ্ধিজীবী, ত্রিশ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোনের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। মহান বিজয় দিবস নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে জাতিকে মেধাশূন্য করতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা এই ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাঁদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ৯ই ডিসেম্বর। তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে এবং সমাজসংস্কারে পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও সমাজসংস্কারক; বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত। ৯ই ডিসেম্বর 'রোকেয়া দিবস'। এ উপলক্ষে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, কবিতা ও নিয়মিত প্রতিবেদন নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যা। আশা করি সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক কাজী শাম্মীনাজ আলম

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি ৪
ড. সালাহউদ্দীন আহমদ

আগামী প্রজন্মের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা ৮
ড. আতিউর রহমান

বিজয়: ইতিবৃত্ত ও মর্মার্থ ১০
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বিজয় অর্জনের গৌরবগাথা ১২
সেলিনা হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় হত্যা করা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের ১৪
হারুন রশীদ

একাত্তরের ড. ত্রিগুণা সেন ১৭
জাফর ওয়াজেদ

ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে একাত্তরের মহান বিজয় দিবস ২০
খালেক বিন জয়েনউদদীন

ফিরে দেখা বাহান্ন বছর ২২
ড. মো. নাজমুল হক

মুক্তিযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ২৬
ড. সরকার আবদুল মান্নান

নারীর আত্মত্যাগে লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশ ২৯
কামরুন নাহার মুকুল

পুণ্যভূমির দেশে ৩৬
ডালিয়া ইয়াসমিন

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের উদ্যোগ ও জনগণের করণীয় ৩৯
দীপংকর বর

মুক্তিযুদ্ধের অমর গাথায় শিল্পী সাধন ও ডা. ফজলে রাব্বী ৪২
শ্যামল দত্ত

আলোর রানি মহীয়সী রোকেয়া ৪৮
মুস্তাফা মাসুদ

একাত্তরের অন্যতম অগ্নিবীর ৫০
মিয়াজান কবীর

দুর্নীতির বিরুদ্ধে হই ঐক্যবদ্ধ ৫২
সৈকত নন্দী

প্রতিবন্ধী দিবস ৫৪
মনোয়ারা বেগম

বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি ৫৬
জেসিকা হোসেন

গল্প

ফসলে শিলাপাত ৩২
ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

সুরবালার অন্তিম ইচ্ছে ৪৫
রফিকুর রশীদ

বিজয় দেখেছি ৫৮
শারমিন জিকরিয়া

কবিতাগুচ্ছ ৬২-৬৬

সোহরাব পাশা, আ. শ. ম. বাবর আলী, ফারুক নওয়াজ, শাফিকুর রাহী, শেখ সালাহ্উদ্দীন, রুস্তম আলী, বাবুল তালুকদার, মোল্লা আলিম, রীনা তালুকদার, নীহার মোশারফ, খোরশেদ আলম নয়ন, শাহীনুর রহমান রিয়াদ, বি. এম. লিটন মাহ্মুদ, আলমগীর কবির, আলম শামস, জাহাঙ্গীর হোসাইন, অরণ্যগুপ্ত, খান চমন-ই-এলাহি, জাফরুল আহসান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৭
প্রধানমন্ত্রী ৬৮
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৭০
উন্নয়ন ৭২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৭২
অর্থনীতি ৭৩
শিক্ষা ৭৪
নারী ৭৫
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৭৬
কৃষি ৭৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৭৮
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৭৮
ক্রীড়া ৭৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি : না ফেরার দেশে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক ৮০

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

বিজয়ের ৫২ বছর

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুরু হয় বাঙালির আন্দোলন। তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, অতঃপর ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রহসন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, মুজিবনগর সরকার গঠন, ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বে শুধু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই করেননি, তিনি একইসঙ্গে তাঁর দেশ পরিচালনার স্বল্পকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশকে বিশ্ব মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতকরণ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ করেছেন সুনিপুণভাবে। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একইসূত্রে গাঁথা। বিজয়ের ৫২ বছরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি অনেক। বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল'। বিজয় সার্থক–দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি', 'আগামী প্রজন্মের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা', 'বিজয়: ইতিবৃত্ত ও মর্মার্থ', 'বিজয় অর্জনের গৌরবগাথা', 'মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় হত্যা করা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের', 'একাত্তরের ড. ত্রিগুণা সেন', 'ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে একাত্তরের মহান বিজয় দিবস', 'ফিরে দেখা বাহান্ন বছর', 'মুক্তিযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্য-সংগীত', 'নারীর আত্মত্যাগে লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশ','মুক্তিযুদ্ধের অমর গাথায় শিল্পী সাধন ও ডা. ফজলে রাব্বী' এবং 'একাত্তরের অন্যতম অগ্নিবীর' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. **৪, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৭, ২০, ২২, ২৬, ২৯, ৪২ ও ৫০**

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি

ড. সালাহউদ্দীন আহমদ

ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। দক্ষিণ এশীয় এই উপমহাদেশের এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীন কাল থেকেই তাদের একটি পৃথক সত্তা অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং বাইরের কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্য মেনে নেবার ব্যাপারে বরাবর অনীহা প্রদর্শন করে এসেছে। ব্রিটিশ শাসন আমলে বঙ্গদেশেই প্রথম জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে তারই পরিণতিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে প্রধানত বাংলার জনৈক মুসলিম নেতা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু এই দলের নেতৃত্ব সবসময় এমন সব লোকদের কুক্ষিগত থাকে যাদের অধিকাংশ ছিলেন ব্রিটিশ রাজের অনুগত সমর্থক এবং রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিভূ।

মুসলমানসমাজের পশ্চাৎপদতার সুযোগে জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগ ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম জনগণের সমর্থন লাভের প্রয়াস পেতেন। ১৯৪০ সালে যখন মুসলিম লীগ পাকিস্তান-দাবি উত্থাপন করে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ মুসলমান থাকায় তারাও এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তাদের বিশ্বাস ছিল তারা যদি একটি পৃথক আবাসভূমি লাভ করে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম পূরণ সম্ভব হবে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের সমবায়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবিতে গৃহীত যে প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়ে এসেছে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সেটিও উত্থাপন করেন বাংলার অপর একজন বিখ্যাত মুসলিম নেতা এ. কে. ফজলুল হক।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান উপপাদ্য হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম রাজনৈতিক আচার-আচরণে যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ আত্মপ্রকাশ লাভ করতে থাকে, সেটা ছিল এক ক্রান্তিকালের বিশেষ ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলমান, আর দীর্ঘকাল থেকেই এরা এদের সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে একটি সমস্যায় ভুগছিলেন। একদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা ধর্মীয় বন্ধনের কারণে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন; অপরদিকে তারা তাদের দেশজ সাংস্কৃতিক পটভূমি অক্ষুণ্ন রেখে স্থানীয় অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা বোধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমানদের এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বিশিষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির অধিকারী একটি একক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করবার প্রবণতা প্রায়শই বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ সরকার এই যুক্তিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার প্রয়াস পান যে, যেহেতু উর্দু ভারতীয় উপমহাদেশের

মুসলমানদের 'জাতীয়' ভাষা, সুতরাং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি একমাত্র এরই রয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এমনকি ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকার জনসমাবেশসমূহে মি. জিন্নাহ বিশেষ জোরের সঙ্গে যেসব যুক্তির অবতারণা করেন, যেমন– পাকিস্তান এক অখণ্ড রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানিরা এক অবিভাজ্য জাতি বিধায় রাষ্ট্রভাষা মাত্র একটাই হতে পারে আর সেটা হওয়া উচিত উর্দু। এসব যুক্তি বাঙালি মুসলমান, বিশেষত ছাত্রসমাজের তুমুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তারা দাবি করলেন, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, কারণ পাকিস্তানের অধিকাংশ জনসংখ্যা পূর্ববঙ্গে বাস করে এবং তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। ছাত্র আন্দোলনকে হিন্দু বা কমিউনিস্ট-অনুপ্রাণিত বলে চিত্রিত করবার জন্য মুসলিম লীগ সরকার যে প্রচেষ্টা চালান তা সফল হয়নি। অবশেষে উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণার দাবি সরকার মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ছাত্র আন্দোলনের ফলে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে একটি জোরদার আঞ্চলিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এর জোয়ার মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে দুই দুই বার সামরিক আইন জারি করেও এই আন্দোলন প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, আমলা, পুঁজিপতি ও সমরনায়কদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক ভাবধারাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। এই অনুভূতি থেকেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।

যে আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেটি কোনো ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। সেটি ছিল স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। হিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে– এই আশঙ্কা আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদিও ঐতিহ্যিক ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম অবিভাজ্য, আধুনিক মুসলিমসমাজ সম্পর্কে একথা সত্য নয়। পাকিস্তান আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, ধর্মীয় নয় (যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছিল) এবং এতে যে ইসলামি ধর্মীয় রাষ্ট্র বা পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল না তা স্পষ্ট বুঝা যায় এর নেতৃত্বের চরিত্র থেকেই। ঐতিহ্যিক ইসলামের প্রতি এর নেতৃবৃন্দের সামান্য সংখ্যকেরই একটি গভীর ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল। প্রধানত এই কারণেই মজলিস-ই-আহ্‌রার, জমিয়ত-উল-উলামা-ই-হিন্দ প্রভৃতি গোঁড়া মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম লীগকে সমর্থন করত না। তাদের যুক্তি ছিল এর নেতৃত্ব যথাযথ ইসলামি নয়। এইসব গোঁড়া মুসলিম ধর্মবিদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও (স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমস্ত মুসলিম ধর্মবিদই মুসলিম লীগের বিরোধী ছিলেন না), মুসলিম লীগ মুসলিম মধ্যবিত্তসমাজের এবং তাদের মাধ্যমে মুসলিম গণসমাজের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। তাদের জন্য পাকিস্তান ছিল বহুমুখী উন্নতির একটি সুযোগ-বিশেষ।

অন্যদিকে নিছক বাস্তব বিবেচনার খাতিরেও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় গুরত্ব আরোপে সক্ষম হয়নি। শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায় থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব এসেছিল। একটি ধর্মীয় বা ইসলামি রাষ্ট্রের দাবি একবার উত্থাপিত হলেই যে প্রশ্নটি পরবর্তী মুহূর্তেই উঠত, রাষ্ট্রে কোন সম্প্রদায়ের ইসলাম আসীন হবে? তাছাড়া যেহেতু নেতৃবৃন্দ নিজেরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে গোঁড়া ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না, তারা যে রাষ্ট্র দাবি করতেন তাতে কী করে ইসলামি আইন ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তনের জন্য তারা সুপারিশ করবেন? পূর্বেই বলা হয়েছে, নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন বিভিন্ন উপসম্প্রদায়গত পটভূমি থেকে। আগা খাঁ বহু বছর ধরে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ ইসমাইলিয়া শিয়াদের প্রধান। জিন্নাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, অথচ তিনিও ছিলেন পশ্চিম ভারতের একটি ক্ষুদ্র শিয়া উপসম্প্রদায় বোহরাসমাজের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানের দার্শনিক-কবি স্যার মোহাম্মদ ইকবাল গোঁড়া সুন্নি সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার গোঁড়ামি-বর্জিত ধর্মীয় মতবাদের কারণে প্রাচীনপন্থি ইসলামের ধ্বজাধারীদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন না।

উপরন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি যে পাকিস্তানের ধারণা ক্রমশ গড়ে ওঠে তাতে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাকিস্তানে প্রচুর সংখ্যক অমুসলমান এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে বাধ্য। যদি পাকিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র হয় তবে অমুসলমানদের অবস্থা জিম্মি তথা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পর্যবসিত হবে। অথচ এইসব লোকের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশেরও অধিক হতো। এই অবস্থা অমুসলমানগণ মেনে নেবে সেটা আশা করা সুকঠিন ছিল। একথা সত্য যে, মুসলিম লীগ নেতারা মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে 'ইসলামি সামাজিক বিচার', 'ইসলামি সমাজতন্ত্র', 'ইসলামি গণতন্ত্র' প্রভৃতির কথা বলতেন– কিন্তু তারা কখনও এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে সাহসী হননি; এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, তারা কখনও সুস্পষ্টভাবে একথা বলেননি যে, পাকিস্তানের আইনকানুন ইসলামের অনুশাসন অনুসারেই রচিত হবে। মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মতোই তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সপ্তম শতাব্দী আরব ভূখণ্ডে যে ইসলামি জীবনধারা গড়ে উঠেছিল তার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। এই বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়ায় মাঝে মাঝে ভারতীয় ইসলামে পুনরুজ্জীবনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নানা আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত উত্তর ভারতের তরিকা-ই-মহম্মদিয়া অথবা ওয়াহাবী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলন। উনিশ শতকে এইসব আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে এবং এসবের প্রতিধ্বনি সাম্প্রতিককালেও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব আন্দোলন ভারতীয় মুসলিমসমাজের গভীরে কখনও প্রবেশলাভ করতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তান দাবি একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, ইসলামি ধর্মীয় আন্দোলনের নয়।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগ অধিবেশনে গৃহীত যে বিখ্যাত প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি দাবি করা হয় তার মধ্যে কোথাও 'ইসলাম' শব্দ ছিল না। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে বলা হয়, 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই দেশের জন্য

কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, অর্থাৎ ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত এলাকাসমূহের সীমানির্দেশ করে এমন সব অঞ্চল গঠন করতে হবে এবং এমনভাবে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে যার ফলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলসমূহে যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু, সেই সব অঞ্চলে এমন সব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে যার মৌলিক অংশসমূহের প্রতিটি স্বশাসিত ও সার্বভৌম হয়।'

পাকিস্তান সৃষ্টির পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর-জেনারেল রূপে ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতির ভাষণে একটি নীতি-বিষয়ক ভাষণ দান করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

> আপনারা স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের মন্দিরে বা মসজিদে বা অন্য যেকোন উপাসনালয়ে যেতে পারেন। আপনারা যে-কোনো ধর্ম, গোত্র বা মতাদর্শের অনুসারী হতে পারেন, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই । ... আমরা এই মৌলিক নীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করছি যে, আমরা সকলেই এক রাষ্ট্রের নাগরিক, সমান নাগরিক।
>
> এখন আমি মনে করি আমাদের সামনে এই আদর্শ রাখতে হবে এবং কালক্রমে আপনারা দেখতে পাবেন, হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ সেটা প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে।

হয়ত জিন্নাহর কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তানকে যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হয়, এর ভিত্তি হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে দেওয়া সঙ্গত হবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জিন্নাহ তার আদর্শের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার মৃত্যু ধর্মনিরপেক্ষতার এই গতিধারাকে রুদ্ধ করে দেয়। নবজাত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার ব্যাপারে জিন্নাহ উত্তরসূরিগণ উপযুক্ত প্রমাণিত হননি। পাকিস্তানের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ফলে বিশেষত ভারতের সীমান্তস্থ প্রদেশসমূহ হতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানে আসতে শুরু করেছিল। এদের পুনর্বাসন একটি দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এইসব শরণার্থীদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে একত্রীকৃত করে দেওয়াও ছিল একটি সমস্যা। সন্দেহ, ঈর্ষা ও মনোমালিন্য দানা বেঁধে উঠতে লাগল, যা সরকারি মহলেও প্রভাব বিস্তার করল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং গঠনমূলক ধারায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান অর্জিত হলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনকি মুসলমানদের শিক্ষিত মহলেও এমনি একটা আত্মতুষ্টির ধারণা জন্মলাভ করেছিল। রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির অভাবে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের নিজেদের সুবিধা, মেধাগত সীমাবদ্ধতা এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের আলোকে পাকিস্তানের ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছিলেন।

এভাবেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবন্দ যখন কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে পন্থা নির্দেশে ব্যর্থ হলেন, তখন ধর্মনেতাগণ তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা নিয়ে অগ্রসর হলেন। তারা যুক্তি দিলেন, পাকিস্তান যেহেতু মুসলমানদের আন্দোলনের ফল সুতরাং এখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কর্তব্য। ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতার দোহাই দিয়ে উলেমাগণ পাকিস্তান সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন অর্থ এবং ধারণা সৃষ্টি করলেন। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদগণ সুস্পষ্টভাবে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার উদগ্র তাগিদে তারা উলেমাদের সাথে আপোশ করতে দ্বিধা করেননি। ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ প্রস্তাব হতে উলেমাদের এই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এই প্রস্তাবে পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্র রূপে উল্লেখ করা হয় 'যেখানে পবিত্র কোরান ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও অনুশাসন অনুসারে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করা হবে।' ১৯৫৬ সালের যে শাসনতন্ত্রে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হয়, সেখানে এই প্রস্তাবটি সংবিধানের প্রস্তাবনা-অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়।

পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দকে এখানে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস বরাবর ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচি অনুসরণ করে এসেছে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কতিপয় নেতাও মুসলমান ছিলেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্যও ছিল সুস্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শে কংগ্রেস আস্থাবান ছিল। ফলে স্বাধীনতার স্বল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস অনায়াসে একটি সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ শুধু একটি সংবিধান রচনা করতেই ব্যর্থ হননি (প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৬ সালের পূর্বে কোনো সংবিধান রচনাই সম্ভব হয়নি এবং ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করার ফলে সেটিও বাতিল হয়ে যায়); তারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ভিত্তিও নস্যাৎ করে দেন। গভর্নর-জেনারেল পদ গ্রহণ করে জিন্নাহ একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেন। গভর্নর-জেনারেল বা প্রেসিডেন্টের একটি শাসনতান্ত্রিক প্রধান থাকার কথা এবং ভারতে অবস্থা তাই-ই ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে জিন্নাহ গভর্নর-জেনারেল হওয়ায় এই পদটি প্রধানমন্ত্রী পদের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত প্রস্তাবে গভর্নর-জেনারেল রূপে জিন্নাহ প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাই প্রয়োগ করতেন। একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল, পাকিস্তানে রাজনীতি ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক ছিল বলে কোনো পদের গুরুত্বে হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর। এভাবেই জিন্নাহ মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী থাকায় এই পদ গভর্নর জেনারেলের পদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং গোলাম মোহাম্মদ হন গভর্নর জেনারেল। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন বেসামরিক আমলা। জিন্নাহ তাকে অর্থমন্ত্রীরূপে কেবিনেটে স্থান দেন। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধিকারী গোলাম মোহাম্মদ

জিন্নাহর দৃষ্টান্ত অনুসরণে কাজ করে চলেন এবং নাজিমুদ্দিনের দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগ নিয়ে সুচতুরভাবে নিজস্ব ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। যেহেতু তার কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না, তিনি অতিমাত্রায় সিভিল সার্ভিস এবং পাঞ্জাবি-প্রভাবিত সেনাবাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। পাকিস্তানে রাজনীতি ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে পর্যবসিত হয়েছিল। শাসকচক্রের অধিকাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি তারা এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করত। এই সময়কাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয়েছে। ফলে বাঙালিদের মধ্যে একটি বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের মনোভাব গড়ে উঠতে লাগল। এই মনোভাবই কালক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। কিন্তু এই উপলব্ধি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে একটি নতুন চেতনা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সময়েই গড়ে উঠতে থাকে। পুরোনো মুসলিম লীগের দ্বিধা-বিভক্তি ও আওয়ামী লীগের জন্ম পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করে। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল এবং রাজনীতির গতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এর কিছু কাল পরেই যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল পূর্ব পাকিস্তানে ন্যক্কারজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও কৃষক শ্রমিক পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে আরও দুটি ধর্মনিরপেক্ষ দলের জন্ম হয়। পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকলেও এর গোপন তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্র ও বৃহৎ পুঁজির প্রভাবাধীন পাকিস্তানি শাসকচক্র এসব নতুন ঘটনাবলিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অপসারণ, ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি– এসব ছিল দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে প্রতিহত করবার একই চক্রান্তের বিভিন্ন দিক।

১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান একটি একনায়কত্বমূলক সংবিধান জনগণের ওপর চাপিয়ে দেন এবং তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটা কার্যত ছিল গণতান্ত্রিক খোলসে একটি স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা। জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চরমভাবে খর্ব করা হয় এবং শাসন বিভাগকে করা হয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। বাঙালিরা অনুধাবন করতে শুরু করল যে, একমাত্র বয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তারা দেশের শাসনব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১৯৬৬ সালের মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'পূর্ব' পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ প্রণীত ছয় দফা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচির নিশ্চয়তা দান করেছিল। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচির পেছনে রয়েছে। মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামির ন্যায় ধর্মীয় দলসমূহ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র এতদিন জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগাচ্ছিল। তারা এবার প্রমাদ গুনল। তারা পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি জনগণের ওপর বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সংগঠিত হলো ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যা এবং তা বিশ্ববিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিলো।

বাংলাদেশের জনগণ এই অত্যাচার প্রতিহত করতে মরণপণ করে রুখে দাঁড়ালো। শুরু হলো জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, যার পরিণতিতে সৃষ্টি হলো স্বাধীন বাংলাদেশের।

সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সম্পূর্ণ প্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতার যে ব্যাধি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিষাক্ত করে আসছিল তার গতি এখন কার্যকরভাবে রুদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িকতা বলতে যা আমরা বুঝে থাকি– এখন সেটা অতীতের ব্যাপার। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশের সমস্ত লোক রাতারাতি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে চিন্তাভাবনা বন্ধ করে দিয়েছে। কুসংস্কার সহজে মরে না। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় কুসংস্কারের ক্ষেত্রে এ সত্যটি অধিকতর প্রযোজ্য হতে পারে, আমাদের মধ্যে কিছু লোক এখনও তাদের পুরাতন চিন্তা ও পুরাতন অভ্যাস বদলাতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় সুদৃঢ় আস্থাশীল। ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা উপলব্ধি করেছেন যে, আধুনিক যুগে ধর্ম রাষ্ট্রের বা সংস্কৃতির ভিত্তি হতে পারে না।

এর দ্বারা ধর্মকে ছোটো করা হয়েছে একথা বলা যায় না, বরং বলা যেতে পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে কায়েমি স্বার্থবাদীদের স্বার্থে অপব্যবহার হতে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই কলুষিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ইতিহাসের এই অকাট্য যুক্তিকেও প্রমাণিত করেছে যে, অবিচার, শোষণ ও জুলুমভিত্তিক কোনো ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

মূল ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ: মোহাম্মদ আবদুল গফুর

[বিজয়ের প্রথম বার্ষিকীতে সৈয়দ আহসান আলী সম্পাদিত বাংলাদেশ শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ থেকে সংকলিত]

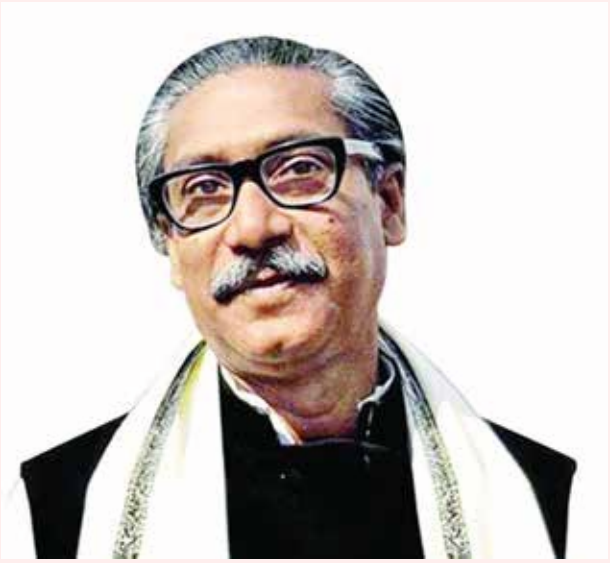

আগামী প্রজন্মের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা

ড. আতিউর রহমান

ডিসেম্বর মাস। বিজয়ের মাস। তাই আমরা স্বদেশের স্বল্পকালীন ও আগামীর সম্ভাবনা নিয়ে আরও বেশি করে ভাবি। মূলত তরুণদের রক্তে-ঘামেই অর্জিত হয়েছে আমাদের এই প্রিয় স্বদেশভূমি। কষ্ট হয় যখন হালের এক জরিপে (৫,৬০০ জনের ওপর পরিচালিত) জানতে পারি যে, তাদের ৪২ শতাংশই বিদেশে চলে যেতে আগ্রহী। কেন এই হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো? এই তরুণদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখতে চাইলে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের চাওয়া-পাওয়ার তল খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণত নির্বাচনি ইশতেহারেই দলগুলো তাদের উন্নয়ন কৌশলের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যেহেতু এবার তরুণ ভোটাররাই সংখ্যায় বেশি তাই তাদের আকাঙ্ক্ষার আলোকেই দলগুলোকে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির ডালা সাজাতে হবে। বিশেষ করে সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের কথা বেশ জোর দিয়েই বলতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে অগ্রাধিকার দিতে হবে খাদ্য নিরাপত্তা, আর্থিক খাতের ব্যবস্থাপনা, বহিঃঅর্থনীতির সুরক্ষাকে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল সকলের কাছে পৌঁছাতে কর্মসংস্থান তৈরিকে প্রধানতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবছর ২০ লক্ষ তরুণ শ্রমবাজারে ঢুকছে। অথচ প্রতিবছর আনুষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ বাড়ছে মাত্র ২ লক্ষ। কাজের সুযোগ বাড়ানোর এবং শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল রাখাতে অল্প সময়ের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার কয়েক গুণ বাড়িয়ে ১৭ শতাংশে ওঠানো গেছে (এর মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ নারী)। তাই কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য ৩-৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের অঙ্গীকার দলগুলোকে দিতে হবে।

বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আইনকানুন আরও সহজ করার পাশাপাশি ডিজিটাইজেশনের ধারাকে আরও বলশালী করতে হবে (স্মার্ট অর্থনীতি)। 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসকে সত্যি সত্যি সকল পর্যায়েই সক্রিয় করতে হবে। পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য যথাযথ জ্বালানি সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক জোনগুলোতে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিঙ্কেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ুবান্ধব প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশে সহায়ক নীতি গ্রহণ করতে হবে (যেমন: সেচ কাজে ডিজেলকে সৌরশক্তি দিয়ে পুরোপুরি প্রতিস্থাপনের প্রতিশ্রুতি)। জলবায়ু অর্থায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

বিদেশমুখী তরুণদের দেশের বিষয়ে আশাবাদী করে তোলার জন্য খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যেমন: ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইটি ফ্রিল্যান্সারের সরবরাহকারী। আইটি ফ্রিল্যান্সারসহ তরুণ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সংযোগ স্থাপনের কর্মসূচি নিতে হবে। তাদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির হাইওয়েতে সচল থাকার অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। ইতোমধ্যে বেশকিছু আইটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। তাদের জন্য নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের আশপাশে আরও ছোটোখাটো প্রযুক্তি হাব গড়ে তোলার জন্য নীতি প্রণোদনা ও স্টার্টআপ তহবিল দিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি থেকে শুরু করে কর প্রদান, ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ সকল সরকারি সেবার শতভাগ ডিজিটাইজেশনের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি রোডম্যাপ গড়ে তোলার অঙ্গীকার দরকার। এরই মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজেশন চোখে পড়ার মতো।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের মানুষের জন্য উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী জীবন নিশ্চিত করতে হবে। তবেই না স্মার্ট নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এজন্য নাগরিকদের 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর পরিকল্পনা চাই। মূলধারার কারিকুলামসহ অন্যান্য মাধ্যমেও (যেমন: গণমাধ্যম) এই 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর কর্মসূচি নিতে হবে। এটা তরুণদেরও কাম্য। সামাজিক মাধ্যমও এক্ষেত্রে উপযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে পুরো সমাজই ডিজিটাল প্রযুক্তি ও 'ইন্টারনেট অব থিংস'-এর সুফল নিতে সক্ষম হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি দারিদ্র্য রেখার একটু উপরে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের সুরক্ষায়ও নতুন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষার পরিকল্পনায় স্বল্পোন্নত দেশের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নশীল দেশের কাঠামোয় যেতে হবে (উদাহরণ: সার্বজনীন পেনশন স্কিম)।

দুর্নীতি এবং অনিয়ম থেকে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সুরক্ষা করার মাধ্যমেই দেশের মানুষকে বিশেষত তরুণসমাজকে দেশ নিয়ে আশাবাদী করা যাবে। তাই অনিয়ম রোধে সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার সব দলের ইশতেহারে থাকা চাই। যেমন: ফসলের মাঠ থেকে শুরু করে শহরের খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সরবরাহ চেইনের বিভিন্ন ধাপে ঘুষ ও চাঁদাবাজি রোধের প্রতিশ্রুতি থাকলে নিত্যপণ্য নিয়ে মানুষের দুর্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমবে। তাছাড়া শ্রমজীবী ও 'সিঙ্গেল প্যারেন্ট' নারীদের জন্য

উপযুক্ত হোটেল, তাদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার কেন্দ্রসহ নতুন সব অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে চাওয়াটা অন্যায় হবে না।

আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের এই প্রত্যাশাগুলো পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এগুতে হবে। তবে তরুণদের স্বদেশমুখী করতে কেবল প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর সেগুলো পূরণের রোডম্যাপ দেওয়াই যথেষ্ট হবে না। আজকের তরুণরা অনেক বেশি সচেতন ও সংবেদনশীল। তাই ভূ-রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক যে চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশের সামনে রয়েছে সেগুলোর দিকেও রয়েছে তাদের সজাগ দৃষ্টি। বিশেষ করে আর্থিক খাতের বিরাজমান সংকটগুলো নিয়ে আর সকলের মতো তরুণরাও ভাবিত। নীতি-নির্ধারকদের তাই আর্থিক খাতের সুশাসন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। মুদ্রানীতিকে আরও কিছুদিন সংরক্ষণশীল করতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থেই ঋণ প্রবাহ কমিয়ে আনা দরকার। টাকাকে দামি করা দরকার। তবে লক্ষ্য রাখা চাই যেন উৎপাদনমুখী খাতে (বিশেষ করে কৃষিতে) ঋণ প্রবাহ না কমিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ কমে। যেসব ঋণ দেওয়ার ফলে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে এমএসএমইগুলোর দিকে সুনজর নিশ্চিত করা চাই। ঋণের ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতার কারণে যে সমস্ত ব্যাংক ইতোমধ্যে ঝুঁকির মুখে পড়েছে সেগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে হবে। প্রয়োজনে ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে এগুলোকে আলাদা আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে। ঝুঁকিতে থাকা ব্যাংকগুলোকে আবার শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সেগুলোতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এসব ব্যাংকের কার্যক্রম তদারকিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। টাকা-ডলার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে বাজারভিত্তিক সমাধানের পথে হাঁটা ছাড়া কোনো বিকল্পই নেই। এখন পর্যন্ত বিনিময় হারকে পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে অসাধু ব্যক্তিরা ডলার বাজারের অস্থিরতা/অনিশ্চয়তার সুযোগ নিচ্ছে হয়ত। পাশাপাশি স্পেকুলেটিভ বিহেভিয়ারের কারণেও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় দেশে পাঠানোর প্রবণতা রুখতে শক্তিশালী মনিটরিং করার পাশাপাশি প্রবাসী ও তাদের পরিবারকে বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানোর সুবিধাগুলো সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলার দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে। প্রবাসীদের জন্য তৈরি বন্ডের সুদের হার আরও বাড়ানো এবং ডিজিটাল মঞ্চ থেকে সহজেই তার লেনদেন নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারি ট্রেজারি বন্ডকেও প্রবাসীদের কাছে ডিজিটালি বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যমান সংকটকালে প্রবাসী আয়ের পাশাপাশি রপ্তানি আয় প্রবাহ ধরে রাখাও একান্ত জরুরি। আরএমজি রপ্তানি যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে আরএমজি উদ্যোক্তাদের যথাযথ সুবিধা দিতে হবে। রপ্তানি প্রণোদনার পাশাপাশি ডলার সংকট বা অন্যান্য কারণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করার ক্ষেত্রেও যেন উদ্যোক্তারা কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়েন, তা দেখতে হবে। আরএমজির পাশাপাশি অন্য রপ্তানি খাতগুলোকেও আরও শক্তিশালী করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে চামড়া শিল্পে ২০৩০ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ১০ বিলিয়নে নিয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বাস্তবায়নে বিশেষ মনোযোগ দরকার। বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্যোগে মূল চালিকাশক্তিই হবে তরুণ উদ্যোক্তা ও কর্মীরা। বহুমুখী রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে যেমন তরুণ জনশক্তির ওপর ভর করতে হবে, তেমনি রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধিও তরুণদের স্বদেশ বিষয়ে আরও বেশি আশাবাদী করবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করতে পারলেই আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যে ভরসা সঞ্চার করা যাবে। এ জন্য একদিকে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেমন দক্ষতা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজস্ব আহরণের সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। সরকারের ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি। নির্ধারিত সময়ে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সরকারি প্রকল্পের ব্যয় তদারকির জন্য দরকারবোধে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। আর সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের আশপাশে আটকে না রেখে মধ্যম মেয়াদে ১৫ শতাংশে এবং দীর্ঘমেয়াদে ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হবে। কর আহরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ ডিজিটাইজেশনই এক্ষেত্রে একমাত্র সঠিক পথ। পাশাপাশি কর প্রদানের প্রবণতা বাড়াতে তরুণদের নিয়ে সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তোলা চাই। এসবই হতে পারে আগামী দিনের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ।

আমাদের আশাবাদী তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। তরুণদের প্রত্যাশা হলো– আমাদের নীতি-নির্ধারকরা তরুণদের কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অমিত আর্থসামাজিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি ভরসা-সঞ্চারী পথনকশা হাজির করবেন। আশা করি, রাজনৈতিক দলগুলো সবার জন্য উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অভিপ্রায় তাদের ইশতেহারে যুক্ত করবে।

ড. আতিউর রহমান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বিজয়: ইতিবৃত্ত ও মর্মার্থ

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯৪৬-এর এপ্রিল মাসে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লাহোরের উর্দু পত্রিকা *চাত্তান*-এর সাংবাদিক শোরিস কাশ্মিরীকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ঐ সাক্ষাৎকারের একটি পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, জিন্নাহ বাঙালির ইতিহাস জানে না; বাঙালিরা বেশি দিন বিদেশি শাসন পছন্দ করে না। কাজেই তারা পাকিস্তানের সঙ্গে এক সময় থাকবে না। বাঙালি থাকেনি; ১৯৭১-এ বাঙালি স্বাধীন হয়েছিল।

তবে ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের সঙ্গে জোড় বাঁধা হলেও বাঙালির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবার প্রক্রিয়া সূচিত হয় ১৯৪৭ থেকেই। সে বছর আগস্ট মাসে পাকিস্তান হয়ে গেলে তখনই কলকাতায় সিরাজউদ্দৌলা হোস্টেলে কিছু সতীর্থকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ওই মাউরাদের সাথে বেশি দিন থাকা যাবে না।' বাঙালি বেশি দিন পাকিস্তানের সঙ্গে থাকেনি; ছিল ২৪ বছর ৪ মাস ৩ দিন। ১৯৫৩-তে শের-ই-বাংলা বললেন, 'Leave East Pakistan to work out its own destiny.' ১৯৫৭-তে মওলানা ভাসানী ন্যাপ গঠন করার সময়ে পাকিস্তানকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম।' ১৯৬১-তে এক গোপন বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কমরেড মণি সিংহ এবং কমরেড খোকা রায়কে জানিয়েছিলেন, বাঙালির স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কোনো আপোশ করবেন না। ১৯৬৬-তে ছয় দফার সারার্থ নিয়ে ধূম্রজাল তৈরি হলে, এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু ন্যাপ (মস্কো) নেতা অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহ্মেদকে বলেছিলেন, 'আরে মিয়া, বুজলা না। দফা তো একটাই, ঘুরাইয়া কইলাম।' এই দফা যে স্বাধীনতার দফা তা সেদিন প্রশ্নকর্তা বুঝতে অপারগ হননি। ৬০ দশকের সূচনা থেকে গোপনে প্রয়াস চালানো ছাত্রনেতাদের অন্যতম বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন আবদুর রাজ্জাক অনুযোগ করেছিলেন, ছয় দফায় কেন স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলো। বঙ্গবন্ধুর উত্তর ছিল, 'তোমাদের ওপারে যাওয়ার সাঁকো তৈরি করে দিলাম।' আবদুর রাজ্জাক এমন উত্তরের নিহিতার্থ বুঝেছিলেন। বিবিসি-তে কর্মরত সৈয়দ শামসুল হকের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, 'আমার দফা তিনটা। কত নেছ, কত দেবা, কবে যাবা।' স্বাধীনতার প্রণোদনা তৈরি হচ্ছিল এভাবে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান আইনি কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order) জারি করে ছয় দফার আলোকে সংবিধান পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দিলেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা নির্বাচন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় বক্তব্য ছিল, 'আমার লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নির্বাচন হয়ে গেলে আমি এল.এফ.ও. টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।'

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও দলটি ক্ষমতা বঞ্চিত হলো; শুরু হলো উত্তাল মার্চ ১৯৭১। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা এলো: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' শুধু স্বাধীনতা নয়, মুক্তির কথাও বলা হলো; স্বাধীনতার আগে ছিল মুক্তির কথা। মুক্তির কথা বলা হয়েছিল তিন বার; স্বাধীনতার কথা এক বার। পরোক্ষ ও সাংকেতিক হলেও এই ভাষণই ছিল স্বাধীনতার যথার্থ ঘোষণা। মার্চের ১৬ থেকে ২৪ চলেছিল প্রহসনের আলোচনা, যার আড়ালে ইয়াহিয়া চক্র গণহত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' চূড়ান্ত করেছিল। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ১:১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হন; তার

আগে বাণীবদ্ধ করা স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণায় তিনি বললেন, 'সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' এভাবেই মাওলানা আজাদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করল। বঙ্গবন্ধু শত্রু শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন। শুরু হলো বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন দেশকে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রক্রিয়া ছিল ৮ মাস ২১ দিনের মুক্তিযুদ্ধ, যা ছিল বিশ্বের সংক্ষিপ্ততম মুক্তি/স্বাধীনতা যুদ্ধ। অসম যুদ্ধ (asymmetric war) হিসেবেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রমী। পেশাদার ও পরিপূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিপরীতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সিংহভাগই ছিল তৃণমূলের আমজনতা, যাঁরা জীবনে প্রথম অস্ত্র হাতে তুলে ছিল। কিন্তু এই অসম যুদ্ধে দুর্বলতর পক্ষের বিজয় হয়েছিল, যার নানাবিধ কৌশলগত (strategic) ব্যাখ্যা থাকতে পারে; কিন্তু আমি মনস্তাত্ত্বিক দিকটির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি। ইতালীয় যুদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রাঙ্কো ফোরনারি (Franco Fornari) বলেন, মা এবং মাতৃসম মাতৃভূমির জন্য মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এই ত্যাগের মানসিকতা আমাদের মুক্তিযোদ্ধার ছিল; কিন্তু যা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ছিল না। তারা ছিল ভাড়াটে সৈন্যের মতো; আর বাংলাদেশের মাটি তাদের কাছে মাতৃসম মাতৃভূমি হতে পারেনি কখনও। মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যয়দীপ্ত মন-মানসিকতার রূপায়ণ করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। ১৯৪০-এর ১৩ই মে তিনি কমন্স সভায় বলেছিলেন, Victory at all costs. Victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be; for without victory there is no survival. চার্চিল যেন ১৯৭১-এ আমাদের মনের কথা বলেছেন, তুলে ধরেছেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে। অন্যদিকে বিজয়-গর্বিত মুক্তিযোদ্ধার মানসিকতার বর্ণনা আছে ইংল্যান্ড বিজয়ী উইলিয়াম দ্য কনকারের জবানিতে: 'By the splendour of God I have taken possession of my realm; the earth of England is in my two hands.' ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধার দু'হাতে ছিল বাংলাদেশ।

১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ছিল বিজয়ের দিন, শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দিন। কিন্তু এই বিজয় ছিল খণ্ডিত, শুধু সামরিক মাত্র; সর্বাত্মক বিজয় মানে যে মুক্তি তা তো এখনও অধরা। সেই কারণে বলি, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর; আর মুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকেই, যা আজও চলমান। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলেও মুক্তির যুদ্ধ চালাতে হবে ততদিন যতদিন না বঙ্গবন্ধুর উক্তি অনুযায়ী (১০ই জানুয়ারি ১৯৭২) 'বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বসবাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে।' ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সেক্টর ছিল ১১টি; এখন মুক্তির যুদ্ধে সেক্টর অগণতি। ১৯৭১-এ মুক্তিযোদ্ধার নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল; এখন মুক্তির যুদ্ধে যোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছাড়া দেশের সব মানুষ। ১৯৭১-এ শত্রু চিহ্নিত ছিল; এখন শত্রু ঘরে-বাইরে, সবখানে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ; এখন মুক্তির যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ কঠিনতর। ব্যষ্টিক-সামষ্টিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী response হলে নাকি মানবিক সৃজন-প্রয়াসের স্ফূর্তি ঘটে, জীবন ও জগৎ সমৃদ্ধ হয়। এমন কথা ইংরেজ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবীর (Arnold Toynbee), যা তিনি বলেছেন তার Challenge and Response তত্ত্বে।

বাংলাদেশের বাঙালি স্বাধীন, তবে মুক্ত নয়। বিদেশির শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন হলেও আমরা এখনও পরাধীন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বৈষম্যের কাছে। এই দেশে এখনও সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো না। সুতরাং ১৯৭১-এর বিজয়কে সম্পূর্ণ করতে হলে এখনও অনেক বিজয়ের প্রয়োজন আছে।

বাঙালি শুধু যে লড়াকু, তা নয়, তারা স্বাধীনতাপ্রিয়-ও; তা তো মওলানা আজাদ নির্দেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ফরাসিদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা নিয়ে কথা বললেও, বাঙালি নিয়ে এমন কোনো কিছু বলেননি। তার বিবেচনায় স্বাধীনতা ফরাসিদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য: 'সেই স্বাধীনতার উপর কেউ হাত দিয়েছে তো অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারও উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এটাই ফরাসি চরিত্রের মূলমন্ত্র।' মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অভিন্ন মন্তব্য করতে পারতেন।

তবে ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হলেও রাষ্ট্র স্বাধীন হতে পারেনি। বিজয়-পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামো এবং রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি এমন কথা বলে। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু প্রশাসন কাঠামোর খোলনলচে পাল্টিয়ে রাষ্ট্রকে স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী করতে চেয়েছিল। সেসময় লাগসই প্রক্রিয়ার সূচনাও হয়েছিল; ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার ফলে সব কিছু বিনষ্ট হয়েছিল এবং উর্দিশাসন পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করেছিল। ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান উর্দিশাসন বিদায় করলেও রাষ্ট্র কাঠামোর রূপান্তরণ আজও হলো না।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

বিজয় অর্জনের গৌরবগাথা

সেলিনা হোসেন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিল বাঙালির সামনে স্বাধীনতার নতুন সূর্য। এই দিন রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল পরাজিত পাকিস্তান বাহিনী। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরেছিল 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সাহসী উচ্চারণ বুকে নিয়ে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পরে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। উচ্চারিত হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'– বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিতে উড়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। এই দিন স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব নিয়ে পতাকার মতো উড়ছে ৫২ বছর ধরে।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফিরে আসা স্বাধীনতা অর্জনের আর একমাত্রা। তিনি এসে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ৯ই মে রাজশাহী মাদ্রাসার মাঠে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু বড়ো ত্যাগের বিনিময়ে। এত রক্ত কোনো দেশ কোনোদিন কোনো জাতি দেয়নি, যা আজ আমার বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে। আজ ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। জালেমরা রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। চালের গুদাম ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার সরকারি কর্মচারীদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার পুলিশ ভাইদের, বিডিআর, সামরিক বাহিনীর ছেলেদের গুলি করে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে আমার ছাত্র, আমার যুবক, আমার কৃষক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার সাংবাদিকদের। ... আমি কী চাই? আমি চাই আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক। কিন্তু বড়ো দুঃখ ভাই, জালেমরা কিছুই রেখে যায়নি। সমস্ত নোটগুলি পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা, বিশ্বাস করুন, যেদিন আমি এসে সরকার নিলাম এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রাও পাইনি।'

বিজয় লাভের পরে এই ছিল বাংলাদেশের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশের বিজয় গৌরব ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে। ৫২তম বিজয় দিবস বাঙালির বাংলাদেশের বিশ্বজুড়ে গৌরব অর্জনের দিন। বিজয় দিবস বাঙালি একটি দিনে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বিজয়ের বহুমাত্রিক মাত্রায় বাংলাদেশের নানামুখী বিজয় অর্জন আজকের বিশ্বে দৃশ্যমান প্রেক্ষাপট।

১৯১৩ সালে বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। সেদিন তিনি বাংলা ভাষাকে পুরো বিশ্বের সামনে মর্যাদার অবস্থানে তুলে ধরেছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই গৌরবময় অর্জন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক বিজয়। পাশাপাশি জাতিসত্তার অস্তিত্বের প্রশ্নে এই বিজয় ছিল দিগন্তছোঁয়ার স্বপ্ন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখনই জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান করেছেন তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছেন। বাংলা এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের সরকারি ভাষা হয়নি। সেটা সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। এটাই নেতৃত্বের সাহসী দৃঢ়তা। বিজয় দিবসকে একদিনে সীমাবদ্ধ না রাখার অঙ্গীকার। এভাবে আমাদের বিজয়ের অর্জন ছড়াচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। ... আজ সারা বিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।' এভাবে বিজয়ের অর্জনের মাত্রাকে বহুমুখী করে বাংলাদেশের পথচলা হিমালয় শীর্ষের উচ্চতা লাভ করবে। পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে দেশের মর্যাদার প্রশ্নে আপোশ করতে নেই। দেশ ও জাতিসত্তা বেঁচে থাকার মৌলিক সত্য।

জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'যে মহান আদর্শ জাতিসংঘের সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতে আজকের বাংলাদেশ মানবিক বোধের চেতনায় শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দেশ। বিজয়ের এও এক বিশাল অর্জন।

১৯৯৯ সালে বিজয়ের আর এক অর্জন ঘটেছে যেদিন ইউনেস্কো কর্তৃক আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাঙালি মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবন উৎসর্গ করে যে গৌরব অর্জন করেছিল ইউনেস্কোর এই ঘোষণার মাধ্যমে সে মর্যাদার দর্শন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই বিজয় অর্জনের সূচনা হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি। সেদিন কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম জাতিসংঘের মহাসচিব কফি

আনানকে চিঠির মাধ্যমে বাঙালির শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করার আবেদন করেছিলেন। জাতিসংঘ থেকে জানানো হয়েছিল বিষয়টি ইউনেস্কোর এখতিয়ারভুক্ত। সেখানে পাঠাতে হবে। রফিকুল ইসলাম রীতি অনুযায়ী নানা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আবেদন পত্র সেখানে পাঠান। ইউনেস্কো থেকে জানানো হয় প্রস্তাবটি বাংলাদেশের সরকারের কাছ থেকে আসতে হবে। এরমধ্যে বেশ লম্বা সময় গড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রস্তাব পাঠানোর সময় ছিল মাত্র ২ দিন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে এক সুদূরপ্রসারী বিজয় অর্জন করেছেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বলেছিলেন, ইউনেস্কোতে যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠাতে হবে তা আপনারা দ্রুত পাঠিয়ে দিন। ফাইলের ফর্মালিটিজ পরে সম্পন্ন করবেন।

গৌরব অর্জনে এ এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল। ইউনেস্কোর জেনারেল কনফারেন্সে প্রস্তাবটি সেই সভায় উত্থাপিত না হলে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' প্রস্তাব উত্থাপন ভবিষ্যতে আর হতো না। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পাস হয় মাতৃভাষা দিবসের এই প্রস্তাব। বিশ্বজুড়ে গণমানুষের কাছে পৌঁছে গেছে মাতৃভাষার মর্যাদার এই বার্তা। গৌরবে মহীয়ান হয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর বিজয় দিবস প্রবহমান ধারায় রক্ষা করে চলেছে বিজয়ের গৌরব। এই পর্যায়ে আরও একটি দিন অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ, যেমন ওন্টারিওর টরোন্টো সিটি, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারে সিটি, ভ্যাঙ্কুভার, রিচমন্ড সিটিসহ আরও অনেক শহরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সরকারিভাবে পালিত হয় ২০০৭ সাল থেকে। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টে দিবসটি সরকারিভাবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশ মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবনদানকারী দেশ। পৃথিবীজুড়ে বিলুপ্ত হচ্ছে অনেক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। সব দেশের সামনে এখন আশার আলো নিয়ে উড়ছে লাল-সবুজের পতাকা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ গৌরবময় বিজয় অর্জনের আর একটি অন্যতম মাত্রা। বিশ্বের অগণিত মানুষের অধিকারের প্রশ্নে উচ্চারিত হবে এই ভাষণের পঙ্‌ক্তিসমূহ। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবরে প্যারিসের ইউনেস্কো সদর দপ্তরে মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ঘোষণা দিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি 'বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ। ইউনেস্কো জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি ইতিহাসের বড়ো সময় ধরে বিশ্বজুড়ে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি করেছে। ইউনেস্কোর মাধ্যমে বাঙালির অর্জন বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্য মানবজাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়। অনুপ্রেরণা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে মানুষের মানবিক অধিকারকে সুরক্ষিত করে। বলতেই হবে বাঙালির বিজয় দিবসের বহুমাত্রা নিয়ে ৭ই মার্চের এই ভাষণ বিজয়ের গৌরবগাথা।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার' সম্বোধন করে। ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত ভাষণ বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে বিশ্বজুড়ে। তিনি বিশ্ববাসীকে জড়ো করে বলছেন, ভাইয়েরা আমার। ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচির অ্যাডভাইজরি কমিটির ১৫ জন সদস্য দুই বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক দলিলসমূহ গভীর পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে যে সিদ্ধান্ত দিলো তাতে বাঙালির দরজা খুলে গেছে বিশ্ববাসীর সামনে। যেভাবে বিশ্বের মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণ স্মরণ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায়– For the People, By the People, Of the People. মানুষের প্রতিরোধের জায়গা জোরদার হয়ে ওঠে নেতৃত্বের অমর বাণী থেকে। বাংলাদেশও এই জায়গাটি তৈরি করেছে।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Jacob F. Field একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন *We shall Fight on The Beaches – The Speeches That Inspired History* শিরোনামে। গ্রন্থটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'The Struggle this time, is the struggle for our Independence' শিরোনামে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থটি বিশ্বের অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে ভারতের পশ্চিম বাংলায় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সব মিলিয়ে ১৬২টি ছিটমহল সৃষ্টি হয়েছিল। এসবের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে ছিল ভারতের ১১১টি ছিটমহল। আর ভারতের অংশে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ৫১টি ছিটমহল। একরকম বন্দিজীবন কাটিয়েছে ছিটমহলের অধিবাসীরা। অন্য রাষ্ট্র দ্বারা সীমান্ত রক্ষিত ছিল বলে তাদের ছিটমহলের বাইরে যাওয়ার অনায়াস ব্যবস্থা ছিল না। তারা বঞ্চনার জীবনযাপন করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ধরনের সুযোগসুবিধা বঞ্চিত জীবন ছিল তাদের। ভোটাধিকারও ছিল না ছিটমহলবাসীর। তাঁরা অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশায় দীর্ঘ বছর অতিবাহিত করে। যেদিন ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে দিল্লিতে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। দীর্ঘ বছর গড়িয়েছে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ৬৮ বছর পার হয়েছে। কিন্তু ছিটমহলবাসীর জীবনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবনের মুক্তির সন্ধান মেলেনি। চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালে এই চুক্তির বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি গণমানুষের পক্ষে মানবিক চেতনার দীপ্ত নেত্রী। মানুষের বেঁচে থাকার সহজ সত্যকে তিনি মূল্যায়ন করেন। সমাধানের পথে এগিয়ে আসেন। তারই ফলশ্রুতি দেশভাগের ৬৮ বছর পরে ছিটমহলের মানুষের বন্দিজীবনের অবসান। এটি ছিল মানবিকতার পক্ষে বড়ো ধরনের বিজয় অর্জন।

বাংলাদেশের সমুদ্র জয় এমন আরও একটি বড়ো অর্জন। ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রসীমার যে বিরোধ ছিল তা 'সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে' (ITLOS) নিষ্পত্তি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলেছেন এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। বিশ্বের মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মতো দীপ্ত গৌরবের উদাহরণ থাকবে। এমন আরও অর্জন আছে বাংলাদেশের অর্ধশতাব্দীর বেশি কালের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। আমাদের নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ভাষার মর্যাদা দিয়ে আমরা ওদের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করি। জয় হোক বিজয়ের গৌরবের। জয় হোক দেশবাসীর। বাংলাদেশের মানচিত্রে উড়তে থাকবে– লাল-সবুজ পতাকা। এই পতাকা বিভিন্ন দেশে ওড়ায় বাংলাদেশের ক্রিকেট দল –ওড়ায় বাংলাদেশের ফুটবল– ক্রিকেট খেলোয়াড় মেয়েরা। এই দীপ্ত আলোর দিকে তাকিয়ে এ বছরে উদ্‌যাপিত হোক বিজয় দিবস। আমাদের তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে আসুক বিজয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে।

সেলিনা হোসেন : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও চেয়ারম্যান, বাংলা একাডেমি

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় হত্যা করা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের

হারুন রশীদ

১

প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, কবি ও সাহিত্যিকদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নৃশংস নির্যাতনের পর হত্যা করে। বাঙালি জাতির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা, দার্শনিক ভাবনা, সৃজনশীলতাসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সমাজহিতৈষী কর্মকাণ্ড চিরদিনের জন্য দুর্বল করে দিতে, অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ভাবনা থেকে ঘটানো হয় এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড।

১৯৮৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থে* শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একটি সংজ্ঞা বা মাপকাঠি প্রদান করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে:

> ১. 'শহিদ' অর্থ ২৫-৩-১৯৭১ থেকে ৩০-১-১৯৭২ এই সময়কালে যারা দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে নিহত কিংবা ঐ সময়ে নিখোঁজ হন এবং
>
> ২. 'বুদ্ধিজীবী' অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।

বাংলাপিডিয়ার হিসাব অনুযায়ী শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ১,১১১ জন। তবে এই সংখ্যা নির্ধারণের সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। বিজয়ের প্রথম বার্ষিকীতে সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত *বাংলাদেশ* শীর্ষক স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত এক লেখা অনুসারে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে সারা দেশে নিহত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

> প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক– ৯৬৮ জন;
> মাধ্যমিক শিক্ষক–২৭০ জন;
> কলেজ শিক্ষক– ৫৯ জন;
> আইনজীবীসহ অন্যান্য পেশাজীবী– ৪১ জন।

ঐ স্মরণিকায় ১,০০৯ জনের জেলাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। এরপর ৮ জন গণপরিষদ সদস্য, ১৩ জন সাংবাদিক, ৫০ জন চিকিৎসক এবং ১৬ জন্য অন্যান্য পেশার বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে একটি জাতীয় কমিটির মাধ্যমে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। ২৭শে মে ২০২১ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশ গেজেটের* বিশেষ সংখ্যায় ১৯১ জন বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২২ সালের ২৩শে মে প্রকাশিত *বাংলাদেশ গেজেটের* বিশেষ সংখ্যায় ১৪৩ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রকাশের এই কার্যক্রম চলমান আছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী বিষয়ে বাংলা একাডেমির সংজ্ঞা বা মাপকাঠি এবং স্বাধীনতার পর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা নির্ধারণের প্রয়াস থেকে এটা স্পষ্ট যে শুধু ডিসেম্বর মাসেই নয়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর থেকে ৩১শে জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় এবং যুদ্ধের পরও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে নির্যাতন, হত্যা ও গুমের শিকার হয়েছেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা।

২

১২ই ডিসেম্বর ২০১৩, রাত ১০টা ১০ মিনিট। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জামায়াতে ইসলামির নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করা হলো। এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের বিচারের রায় কার্যকর করা। কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের সাত বছর আগেও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধীতাকারী জামায়াত নেতা, রাজাকার ও আলবদরদের গাড়িতে উড়েছে অনেক রক্ত, ত্যাগ আর তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত আমাদের লাল-সবুজ জাতীয় পতাকা। যে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবকে ধ্বংস ও বিভীষিকার মাধ্যমে ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিল খুনি, ধর্ষক ও লুটেরারা, যে স্বাধীন দেশের অস্তিত্বের বিনাশ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকেছে যারা, তারাই যখন মন্ত্রী হয়ে, নীতি নির্ধারক হয়ে সেই দেশের ভাগ্যবিধাতা বনে যায় স্বাধীনতার সৈনিক এবং স্বাধীনতার গৌরবের অংশীদার মানুষদের কাছে এর চেয়ে কষ্টের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

ধ্বংস, ত্রাস ও বিভীষিকা সৃষ্টিকারী, স্বাধীনতাবিরোধীদের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো সময় বাঙালি নিধন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের সাথে যুক্ত থেকেছে খুনি কাদের মোল্লা। কিন্তু যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কারণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে নতুন প্রজন্মকে জানানোর জন্য ফাঁসি কার্যকরের দশ বছর পর তা পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কেননা, ধর্মের লেবাস পরা যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের জন্য আজও স্বাধীনতাবিরোধী মহল সুযোগ পেলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মায়াকান্না করে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালায় তারা।

২৭শে মার্চ ১৯৭১। মিরপুরের কুখ্যাত কসাই কাদের মোল্লার নেতৃত্বে বিহারী ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের একটি সশস্ত্র দল আক্রমণ করে মিরপুর ৬ নম্বরের ডি ব্লকে অবস্থিত বাংলা একাডেমির কপিরাইটার মেহেরুন্নেসার বাড়ি। কাফের, মুশরিক, ভারতের দালাল এসব আখ্যা দিয়ে তারা মেহেরুন্নেসার দুই ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে শুরু করে। এসব দেখে তাদের মা *কোরান শরিফ* বুকে চেপে ধরে ওদের কাছে কাকুতিমিনতি করে বলতে

থাকেন– আমরা মুসলমান, আমাদের মেরো না। মায়ের সামনে খুনিরা জবাই করে মেহেরুন্নেসার দুই ভাইকে। দুই ভাইয়ের ছিন্ন মস্তক দিয়ে ফুটবল খেলে তারা। উপুর্যপুরি আঘাত ও জবাই করে হত্যা করে তারা মেহেরুন্নেসাকেও। তারপর তার মাকেও জবাই করে মেরে ফেলে। মেহেরুন্নেসার ধড় থেকে মাথা আলাদা করে কর্তিত মাথার চুল দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে মাথাটা টাঙিয়ে দিয়েছিল কাদের মোল্লা। তার সঙ্গীরা কাপড় শুকানোর তারে কাপড়ের মতো করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল মেহেরুন্নেসার মাথাহীন দেহটা।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরু হয়েছিল বুলেট, বন্দুক, বেয়নেট, কামান, মেশিনগান দিয়ে। কিন্তু হত্যাযজ্ঞ শুরুর একদিন যেতে না যেতেই নারকীয় কায়দায় হত্যা করা হলো মেহেরুন্নেসা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কী কারণে এতটা ক্রুদ্ধ ছিল কাদের মোল্লা এবং তার সঙ্গীরা?

কারণ, মেহেরুন্নেসা একজন বাঙালি। আপাদমস্তক বাঙালি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালিকে হত্যা করা। বাঙালি পরিচয় ছাড়াও মেহেরুন্নেসাকে হত্যা করার আর একটি কারণ– কবি ছিলেন তিনি। কবিতায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ছিল তার কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে। মার্চের উত্তাল সময়েও মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে অব্যাহত ছিল তার কবিতা রচনা। জন্মভূমির প্রতি নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তাকে সাহসী করে তুলেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, বিহারী, রাজাকার ও জামায়াতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ২৩শে মার্চ বিহারী এলাকা বলে পরিচিত মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের ডি ব্লকের ১২ নম্বর রোডের নিজ বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়াতে। ঐ ২৩শে মার্চ ১৯৭১ তারিখেই *বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার শেষ কবিতা। দ্রোহ, দাহ আর সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটায় সে কবিতা।

জনতা জেগেছে-
মুক্তি শপথে দীপ্ত আমরা দুরন্ত দুর্বার,
সাত কোটি বীর জনতা জনতা জেগেছে এই জয় বাংলার।
পাহাড় সাগর নদী প্রান্তর জুড়ে–
আমরা জেগেছি নব চেতনার নব্য নবাঙ্কুরে
বাঁচবার আর বাঁচাবার দাবী দীপ্ত শপথে জ্বলি
আমরা দিয়েছি সব ভীরুতাকে পূর্ণ জলাঞ্জলি–
কায়েমি স্বার্থবাদীর চেতনা আমরা দিয়েছি নাড়া
জয় বাংলার সাত কোটি বীর, মুক্তি সড়কে খাড়া।
গণতন্ত্রের দীপ্ত শপথ কণ্ঠে কণ্ঠে সাধা–
আমরা ভেঙ্গেছি জয় বাংলার বিজয়ের যতো বাধা।
কায়েমি স্বার্থবাদী হে মহল কান পেতে শোনো
সাত কোটি জয় বাংলার বীর ভয় করিনাকো কোনো।
বেয়নেট আর বুলেটের ঝড় ঠেলে–
চির বিজয়ের পতাকাকে দেবো সপ্ত আকাশে মেলে।
আনো দেখি আনো সাত কোটি এই দাবীর মৃত্যু তুমি,
চির বিজয়ের অটল শপথ– জয় বাংলা এ ভূমি।

একজন মুক্তিযোদ্ধা, সাহসী বিপ্লবী কবি, একজন নারীর এমন অসামান্য তেজ ও দীপ্তিময় পথচলা সহ্য করতে পারেনি মানবতা ও স্বাধীনতাবিরোধীরা। তাইতো স্বাধীনতার সূচনালগ্নেই বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হলো তাকে। কেননা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পরপরই কাদের মোল্লা ও তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিল, বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির বাসনা অবদমন করতে হলে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার কারিগরদের বিনাশ করতে হবে। সে কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বুদ্ধিজীবী হত্যাপরিকল্পনার দশ মাস আগেই এদেশীয় রাজাকার, আলশামস, আলবদর, জামায়াত নেতা, কর্মী, মানবতা ও মুক্তির বিরোধীতাকারীরা শুরু করেছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড। আর তার প্রথম শিকার কবি মেহেরুন্নেসা। তিনিই প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী।

৩

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকচক্র এবং তাদের দোসররা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের প্রতি ছিল শত্রুভাবাপন্ন। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টোরিয়াল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। শহিদ ড. শামসুজ্জোহাও যুক্ত ছিলেন ভাষার সংগ্রামের সাথে। ১৯৭১ সালে যেসব বুদ্ধিজীবী শহিদ হয়েছেন তাদের বেশির ভাগই যুক্ত থেকেছেন বা অংশগ্রহণ করেছেন ভাষার সংগ্রামে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বিচারপতি হামিদুর রহমানকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে কী করেছে তার উদ্‌ঘাটনের জন্য ঐ কমিশন গঠন করা হয়নি। কমিশনের কার্যপরিধি ছিল সেই অবস্থা খতিয়ে দেখা যে অবস্থায় ১৯৭১ সালে পূর্ব রণাঙ্গনে (বাংলাদেশে) পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কমিটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে নিয়োজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারের বক্তব্য গ্রহণ করে। বক্তব্য প্রদানকালে অফিসাররা রেখেঢেকে যা বলেছে তা থেকেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, ধর্ষণ ও বিভীষিকা লুকিয়ে রাখা যায়নি। পাকিস্তান সরকার হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। ১৯৯৯ সালে *ইন্ডিয়া টুডে* পত্রিকায় রিপোর্টের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র অনুযায়ী ঐ রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয় যে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে। সাধারণভাবে আমরা জানি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা সারা দেশে বাঙালিদের হত্যা করার পাশাপাশি সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, কবি, শিল্পী, প্রকৌশলী, সমাজসেবী, চিকিৎসক, আইনজীবী, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। ২৭শে মার্চ ১৯৭১ কবি মেহেরুন্নেসার বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড তার অন্যতম উদাহরণ।

পাকিস্তানি শাসক এবং তাদের এদেশীয় দোসররা চেয়েছিল বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করতে। সেজন্য তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যার সাথে সাথে বেছে বেছে সারা দেশে বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে। অর্থাৎ, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল অনেক বেশি পরিকল্পিত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে তারা গণহত্যা করে বাঙালির সংগ্রামকে ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ধ্বংস করতে চেয়েছিল বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। কিন্তু বাঙালির আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রত্যয় ও দৃঢ়তার কাছে পরাভব মেনেছে তারা।

তথ্যসূত্র

শহীদ বুদ্ধিজীবী গ্রন্থকোষ (বাংলা একাডেমি)

'৭১: গণহত্যার দলিল (মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর)

শহীদ বুদ্ধিজীবী: সংজ্ঞা ও সংখ্যা/ চৌধুরী শহীদ কাদের (১৪-১২-২০২২ তারিখ বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম-এ প্রকাশিত)।

হারুন রশীদ: নাট্যকার, লেখক ও অভিনেতা, haroon.r.84.adm@gmail.com

ফোর্বসের ক্ষমতাধর তালিকায় শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাবসাবাণিজ্য বিষয়ক সাময়িকী *ফোর্বস* ২০০৪ সাল থেকে বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকা প্রকাশ করছে। তালিকা করার ক্ষেত্রে অর্থ, গণমাধ্যম, প্রভাব ও প্রভাবের ক্ষেত্র এই চার বিষয় বিবেচনায় নেয় তারা। এরই ধারাবাহিকতায় *ফোর্বস* চলতি বছর বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাধর নারীর তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন। এতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৬তম স্থানে রয়েছেন।

এবারের তালিকায় ছয়টি শ্রেণির মধ্যে রাজনীতি ও নীতি শ্রেণিতে নাম রয়েছে শেখ হাসিনার। তালিকায় রাজনীতি ও নীতি শ্রেণিতে ১৮ ক্ষমতাধর নারী স্থান পেয়েছেন। তাদের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছেন ৭৬ বছর বয়সি শেখ হাসিনা। *ফোর্বস*-এর এবারের তালিকায় শীর্ষে থাকা ইসির প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে ইউরোপীয় তৎপরতা এবং কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লগার্দ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। চতুর্থ স্থানে আছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। পঞ্চম স্থানে মার্কিন তারকা টেইলর সুইফটের নাম রয়েছে।

ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবারের তালিকায় ৩২তম অবস্থানে রয়েছেন। তিনিসহ ভারতের আরও চারজন নারী এ তালিকায় জায়গা পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে *ফোর্বস* লিখেছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়ের প্রধানমন্ত্রী তিনি। বর্তমানে তিনি চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। গত নির্বাচনে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে জয়ী হয়। টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকারপ্রধান হন শেখ হাসিনা

প্রতিবেদন : ইশরাত হক

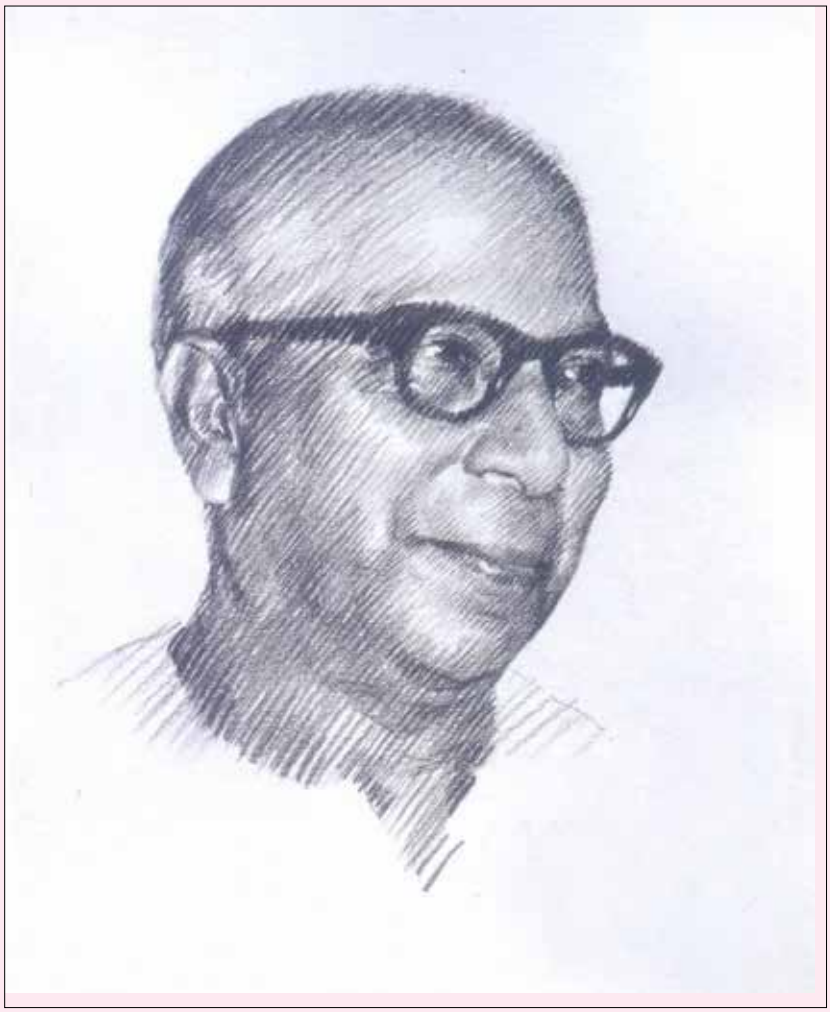

একাত্তরের ড. ত্রিগুণা সেন

জাফর ওয়াজেদ

বাংলার জনগণের মুক্তির দাবিতে ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। জন্মভূমির প্রতি অগাধ টান তাঁকে টেনে নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তি হিসেবে অনেক বিদেশি ব্যক্তিই আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। মনপ্রাণে তারাও চেয়েছিলেন বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যা বন্ধ হোক এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে ঠাঁই নিক। সব শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে তারা এগিয়ে এসেছিলেন। সাহায্যের সবটুকু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সেই ঋণ অপরিশোধ্য। শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন যেসব বিদেশি, তাদের ক্রমান্বয়ে সম্মাননা জানিয়ে আসছেন। এদেরই একজন ড. ত্রিগুণা সেন। স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পর পেছনে ফিরে তাকালে তাঁর সেই অবদানকে অতুলনীয় এবং প্রবল সহায়ক হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তিনি। মুক্তির সোপান খুলে দিতে নেপথ্যচারী তিনি শ্রমে-কর্মে-চিন্তা-চেতনায়-পরিকল্পনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জাতির স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রেখে দেশোদ্ধারে সর্বাত্মক সহায়তায় তিনি ছিলেন প্রাগ্রসরদের একজন। গোপনে কত সাহায্য ও সংগঠন করেছিলেন তা জানা নেই অনেকের। জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গের সিলেটে, ১৯১১ সালে। স্বদেশি আন্দোলনের জন্য জেলও খেটেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। উপাচার্যও ছিলেন। কলকাতা শহরে মেয়রের দায়িত্বও পালন করেছেন। আর রাজনীতি ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। ইন্দিরা গান্ধী সরকারের শিল্প ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীও ছিলেন। এসব কিছু ছাপিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে সেই ১৯৬৫ সাল থেকেই।

'আজাদ পূর্ব পাকিস্তান' বেতার কেন্দ্র চালু করে পূর্ববঙ্গের জনগণের আলাদা রাষ্ট্রের কেন প্রয়োজন সেসব প্রচারণাও চালিয়েছিলেন। আর একাত্তর সালে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সহায়তার নেপথ্য কুশলী ছিলেন ড. ত্রিগুণা সেন, ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরম সুহৃদ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ও মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের চিফ সেক্রেটারি রুহুল কুদ্দুসের শিক্ষক। কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ড. ত্রিগুণা সেনের পরিচয় হয়েছিল চল্লিশের দশকে। পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য যে নেপথ্য তৎপরতা ছিল, তাতে ভারত সরকারের পক্ষেও লিয়াজোঁ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে শরণার্থী ক্যাম্প, ইয়ুথ ক্যাম্প, বাংলাদেশের পক্ষে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠনের আর্থিক সহায়তার নেপথ্যেও ছিলেন তিনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসেবে সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী শিবিরগুলোও পরিদর্শন করেছেন। কোন ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, তা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার কাজ তিনিই করিয়েছিলেন। তিনি ছাত্র ও শিক্ষকসমাজে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিক্ষক এবং সংগঠক দুই ক্ষেত্রেই ছিলেন পারদর্শী, কুশলী, প্রজ্ঞাবান। নিরলস কাজ করেছেন আলোকবর্তিকা প্রজ্বলনের জন্য।

ব্রতচারী আন্দোলনের পথিকৃৎ গুরু সদয় দত্তের ভাগ্নে ত্রিগুণা সেন ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসেবে ঢাকায় পৌঁছে সরাসরি বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে দু হাত বাড়িয়ে ড. ত্রিগুণা সেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'ড. সেন আমি জানি আপনি আমাদের জন্য কী করেছেন।' ত্রিগুণা সেন স্বভাবজাত বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, 'না না, যা করার কিছুই

করতে পারিনি।' বঙ্গবন্ধু সরকারের কেবিনেট সচিব রুহুল কুদ্দুস বঙ্গবন্ধুকে পূর্বেই ড. সেনের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎপরতার কথা জানিয়েছিলেন। তিনিই ড. সেনকে বঙ্গভবনে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ড. সেন এক ঘণ্টারও বেশি আলাপ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন নিয়েও কথা বলেন। এসময় সিলেটের আরেক কৃতী সন্তান রবীন্দ্র স্নেহধন্য সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের কথা ভাবছিলেন, সেসময় ড. ত্রিগুণা সেন ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। ১৯৬১ সালে যখন আসামের কাছারে ভাষা আন্দোলন হয়, তখন তিনি শিলচরে ছিলেন। সেসময় পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ঘটে। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবরাখবরও পেতেন। লন্ডনে ছাত্র রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হয়েছে ষাটের দশকে। পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা যে প্রয়োজন এবং তাদের আলাদা রাষ্ট্র গড়ে তোলা অবশ্য কর্তব্য বলে ত্রিগুণা সেন মতামত দিতেন। আর এই রাষ্ট্র গঠনে ভারতের নেহেরু সরকারকে প্রভাবিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ১৯৬২ সালে আগরতলা গিয়েছিলেন। এই ত্রিপুরা থেকেই ড. ত্রিগুণা সেন রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আগরতলার গোপন সফরের পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষে একটি সহায়ক শক্তি গড়ে তোলা হয়েছিল।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় মামা গুরু সদয় দত্তের ব্রতচারী চর্চা তার মনোবলকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৩২ সালে জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে আসার পর পুলিশের নজরে পড়েন। সিলেটে কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার পর বিহারে চলে যান। সেখানে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মাস কয়েক জেল খাটেন। কিন্তু ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আবার স্বদেশি আন্দোলনে ঢুকে পড়েন। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় ড. ত্রিগুণা সেন এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। 'প্রোপাগান্ডামূলক' প্রচারণা হলেও তিনি কৌশল নিয়েছিলেন ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম থেকে 'আজাদ পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র' এবং 'আজাদ বাংলা বেতার কেন্দ্র' চালু করেছিলেন। যার মধ্যমণি ছিলেন তিনি। এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করতেন স্নেহাংশু কান্ত আচার্য, পান্না লাল দাশ গুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, মনুভাই ভিমানি ও হেমচন্দ্র গুহ। শেষোক্ত জন পরবর্তী সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৭ দিন স্থায়ী যুদ্ধের ১৫ দিন ধরে বেতার কেন্দ্র দুটি চালু ছিল। প্রায় একই অনুষ্ঠান প্রচার হতো।

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তান রণাঙ্গনেই মূলত যুদ্ধ হয়। ভারত 'পূর্ব পাকিস্তানে' হামলা চালায়নি। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ২৩শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যুদ্ধ শেষে এক বিবৃতিতে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে ১৭ দিনের যুদ্ধকালীন সময়ে এতিমের মতো ফেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লেফট রাইট করে হেঁটে যেত তবুও তাদের বাধা দেওয়ার মতো অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ব বাংলার ছিল না।' যুদ্ধ শেষের মাস চারেক পর বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন ছয় দফা, বাঙালির মুক্তিসনদ। তারও আগে পাক-ভারত যুদ্ধচলাকালে মুক্তিকামী বাঙালির সুহৃদ ড. ত্রিগুণা সেন 'পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা রাষ্ট্র চাই, স্বাধীনতা চাই' মর্মে অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছিলেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ত্রিগুণা সেনের কক্ষেই পরিকল্পনা হতো অনুষ্ঠানের। এতে পূর্ববঙ্গের দেশত্যাগী শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরাই অংশ নিতেন। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের পল্লি গানও বাজানো হতো। পূর্ববঙ্গের মানুষ যে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে সেসব তুলে ধরা হতো অনুষ্ঠানে। কলকাতায় অনুষ্ঠান রেকর্ড করার পর মনুভাই ভিমানি সুন্দরবনে লুকিয়ে লঞ্চে গিয়ে সীমান্তের বয়রার কাছে এবং আসামের করিমগঞ্জে অপর একজন 'টেপ' নিয়ে যেত। আসামের আজাদ বাংলা বেতার কেন্দ্র ও খুলনা সীমান্তের আজাদ পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে পৃথক ঘোষকের কণ্ঠে অনুষ্ঠান হতো। ঘোষণার কাজটি স্নেহাংশু আচার্য ও মনুভাই ভিমানি করতেন। এই দুটো স্থানে ট্রান্সমিটার স্থাপন ও অনুষ্ঠান প্রচারণার পুরো পরিকল্পনাই ছিল ড. ত্রিগুণা সেনের। *আনন্দবাজারের* সে সময়ের বার্তা সম্পাদক শান্তিনিকেতনের কৃতী ছাত্র সিলেটের অমিতাভ চৌধুরী গোটা পাঁচেক কথিকা পাঠ করেছিলেন 'বাঙালির স্বাধীনতা কেন' প্রয়োজন নিয়ে।

আজাদ বাংলা ও আজাদ পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র চালুর অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালুতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন নেপথ্য থেকে। সীমান্ত আগরতলা বা করিমগঞ্জে বেতার কেন্দ্র চালু করা যায় কি না তা সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ড. ত্রিগুণা সেন মুজিবনগরে শক্তিশালী ট্রান্সমিটার স্থাপনের পদক্ষেপ নেন। চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র পাকিস্তান বাহিনীর বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা একটি ট্রান্সমিটার জিপে করে কোনোভাবে সরিয়ে নেয়। পরে আগরতলার কাছে কর্নেল চৌমুহনীতে তা স্থাপন করা হয়। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। কিন্তু তার পরিধি ছিল কুমিল্লার সীমান্ত এলাকা, নোয়াখালী ও সিলেটের সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা এবং রামগড়। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার হলেও শ্রোতাগণ্ডি ছিল সীমিত। ড. ত্রিগুণা সেন স্বাধীনতাকামী বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে তিনি আগরতলা যান মে মাসের প্রথমে। শরণার্থী শিবির, ইয়ুথ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সম্প্রচার সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ড. আনিসুজ্জামান তখন আগরতলায়। *আমার একাত্তর* গ্রন্থে ড. ত্রিগুণা সেন সম্পর্কে লিখেছেন, সমষ্টিগতভাবে আমাদের কোনটির প্রয়োজন, তা পরিমাপ করতে এলেন ড. ত্রিগুণা সেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে তিনি এসেছেন তখনকার মতো এটাই তার প্রধান দায়িত্ব। শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের পর তার সঙ্গে বিশেষ একটা বৈঠক হলো আমাদের কয়েকজনের। সেখানে আমাদের সরকারের পক্ষে ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এমএনএ, তাহের উদ্দিন ঠাকুর

এমপি ও মাহবুবুল আলম চাষী সিএসপি, নাগরিক সমাজের পক্ষে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শরণার্থী শিক্ষক এবং ত্রিপুরার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শচিন সিংহ।

বৈঠকে শরণার্থী শিবির ও যুব শিবিরগুলোর ব্যবস্থাপনার কথা, আলোচিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সজোরে চালু করার বিষয়টি। আমাদের অনুরোধ মতো, একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার দেওয়ার সুপারিশ করবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, সে প্রতিশ্রুতি দিলেন ড. সেন। এর পর ড. সেন করিমগঞ্জ গিয়েছিলেন। সেখানে 'আজাদ বাংলা বেতার কেন্দ্র'র মতো কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা বাতিল করেন সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে। কলকাতায় ফিরে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট সচিব রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে আলোচনা করে ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। ১৯৭১ সালের ২৩শে মে ট্রান্সমিটার স্থাপন করা পুরো অনুষ্ঠানের টেপ একটি ব্রিফকেসে বহন করে বার্তা দূত নিয়ে যেতেন সম্প্রচার কেন্দ্রে। সেখান থেকেই অনুষ্ঠান প্রচার হতো।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কক্ষের পাশের রুমেই ছিল রেকর্ডিং স্টুডিও। গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। ২৫শে মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ রেডিও স্টেশন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বেতার কেন্দ্রের এটি ছিল তৃতীয় পর্যায়। প্রতিদিন তিনটি অধিবেশন হতো তিন বেলা। এই বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে আর্থিক সহায়তার কাজটি করেছিলেন ড. ত্রিগুণা সেন। তারই পরিকল্পনায় একাত্তরের জুন মাসে 'পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য' আলাদা প্রচার তরঙ্গ চালু করে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র। এটি করা হয়েছিল বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য। বাংলাদেশের পক্ষে অনেক অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো এই কেন্দ্র থেকে। ড. ত্রিগুণা সেন মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারেও আর্থিক সহায়তার জোগান দিয়েছেন।

ড. ত্রিগুণা সেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, প্রচার-প্রচারণা, শরণার্থী শিক্ষকদের কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণে সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বিক্রমপুরের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ও সরোজিনী নাইডুর কন্যা, পশ্চিমবঙ্গের এককালীন গভর্নর পদ্মজা নাইডুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ কমিটি। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য মৈত্রেয়ী দেবী এবং গৌরী আইয়ুব সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সমিতি এবং শরণার্থী দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিশুসদন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্টজনের নেতৃত্বে আরও সংগঠন গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশের পক্ষে। শরণার্থী শিক্ষকরা গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, আর্কাইভস ও তথ্য ব্যাংক। বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইন্টেলিজেন্সিয়াল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এসব সংগঠনের দু-একটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পুস্তিকা প্রকাশ করে তা বিলিও করে। বিদেশেও পাঠানো হয়েছিল।

শরণার্থী শিক্ষকদের জন্য কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছিল। ড. ত্রিগুণা সেন এই সংগঠনের জন্য আর্থিক জোগানও দিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ত্রিগুণা সেনের পরিচয়। ড. সেন তখন রিপন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে যখন বঙ্গভবনে পৌঁছেন ড. ত্রিগুণা সেন আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রম ও স্বপ্ন সফল হয়েছে এই ছিল তাঁর বড়ো প্রাপ্তি। বঙ্গবন্ধুর আলিঙ্গনের ভেতর দিয়ে সেই সত্যকে উপলব্ধি করলেন, যা তিনি চেয়েছিলেন অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ক। ড. সেনের সঙ্গে এসেছিলেন মনুভাই ভিমানি। ছিলেন হোটেল পূর্বাণীতে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলিঙ্গনের সেই চিত্র পরদিন সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ড. সেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও গিয়েছেন। সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন।

১৯৬৭ সালে যখন ড. সেনকে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন সেখানে ছাত্র অসন্তোষ চলছিল। ছাত্রদরদি বলে যাঁর নাম-ডাক সেই ড. সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে ফিরিয়ে আনেন শিক্ষার পরিবেশ। সেই সুবাদে কিছুদিনের মধ্যে হলেন ইন্দিরা গান্ধী সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন। সম্পদ তখন তাঁর অল্প টাকার পেনশন। নিজের বাড়িঘর নেই। দুটি মাত্র কন্যা বিবাহিত। অগত্যা চলে গেলেন 'মা আনন্দময়ীর আশ্রমে' হরিদ্বারে। টানা ১৬ বছর ছিলেন। সেখানে তাঁর কাজ ছিল আগত অতিথিদের জুতা পাহারা দেওয়া। মাঝেমধ্যে কলকাতায় আসতেন গেরুয়া লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি গায়ে। আনন্দময়ী মার মৃত্যুর পর চলে আসেন কলকাতায় বড়ো মেয়ের আশ্রয়ে। তারপর যেন হারিয়ে গেলেন সবকিছু থেকে।

১৯৮৬ সালে কলকাতায় সিলেটবাসীর পুনর্মিলনীতে বলেছিলেন, আমার একটি মাত্র ব্রত– সবাইকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবেসে ছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষকে, যেখানে জন্মেছিলেন। ভালোবেসে তাদের মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন নেপথ্যে। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে, বিস্মৃতপরায়ণ বাঙালির মনে পাওয়া না গেলেও। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১২ সালে ড. ত্রিগুণা সেনকে মরণোত্তর সম্মাননা জানিয়েছিলেন। বিজয়ের মাসে মনে আসে মুক্তিযুদ্ধের অন্য রণাঙ্গণের এই বীরকে। তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ছিল সহায়ক।

জাফর ওয়াজেদ: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে একাত্তরের মহান বিজয় দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাঙালির জাতীয় জীবনে অনন্য দিন ষোলোই ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এদিন শত সংগ্রাম ও আন্দোলনের রক্তাক্ত অর্জন আমাদের স্বাধীনতার পূর্ণ প্রাপ্তি। এদিন আমরা দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করি। বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন দেশ 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ে আমাদের পাশে ছিল ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ভুটানসহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশ ও দেশের জনগণ।

আমাদের বিজয় দিবসের সময়পঞ্জি বাহান্ন বছর অতিক্রান্ত হলো। এই দীর্ঘ সময়ের অর্জনগুলো বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন সোনার বাংলারই স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন সফল করে তুলেছেন। আমরা উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী আজ।

কিন্তু এই অর্জনের ইতিহাস একদিনে সাধিত হয়নি। এর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে, যা শুধু সংগ্রামী ও রক্তাক্ত ইতিহাস। আমাদের বাপ-দাদারা ১৯৪৭ সালে একবার স্বাধীনতা লাভ করে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। তারও পূর্বে উপমহাদেশের বিভক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব করে, যে ভাষা পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ভাষা নয়। তখনই বাঙালি জনপদের জনগণ ক্ষেপে ওঠে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেখ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক আব্দুল কাসেম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং রুখে দাঁড়ান। এক পর্যায়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় প্রথম আন্দোলন শুরু হয়। যার অংশীদার ছিল তমদ্দুন মজলিশ, ছাত্রলীগের মাতৃভাষা প্রিয় তরুণেরা। অন্যান্য নেতৃবর্গও এতে যোগ দেন। বঙ্গবন্ধুসহ অনেকেই পাকিস্তানিদের হাতে কারাবরণ করেন নাজিমুদ্দিনের নির্দেশে। সেই থেকে বাঙালির নবজাগরণ এবং স্বাধিকারের প্রশ্নে প্রথম স্ফুরণ।

এরপরের ইতিহাস আরও সংগ্রামবহুল ও রক্তাক্ত। বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলনে জীবনদান, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা, আটষট্টির আগরতলা মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয়, একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার নির্দেশনামার ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যা এবং ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের পর বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীদের পাকিস্তানিদের চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বাংলাদেশ সরকার গঠন ও প্রকাশ্যে শপথের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের যুদ্ধ পরিচালনার পর ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের পরম প্রাপ্তি শত্রুমুক্ত বাংলাদেশ, সেই একাত্তরের মহান ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এবং দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম ও ১৫ হাজার যৌথ বাহিনীর মিত্রসৈন্যের আত্মত্যাগের পাওনা আমাদের মাতৃভূমি।

পাকিস্তানের সৈন্যরা ডিসেম্বরের চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষের দিকে যুদ্ধে টিকতে না পেরে অবশেষে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় ৯০ হাজার

ঘাগুসৈন্য এবং দেশীয় রাজাকার, আলশামস ও আলবদর নিয়ে। এই ঢাকায় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় পাকিস্তানের প্রধান নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে বাঙালির রক্তখেকো ইয়াহিয়ার অনুমতি নিয়ে। আত্মসমর্পণের সেই ইতিহাসের ঘটনা যুদ্ধ পরাজয়ের কাহিনিকে ম্লান করে দিয়েছে। আমাদের যৌথ বাহিনীর প্রধান অরোরা ও ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের স্টাফ প্রধানের (জেনারেল জ্যাকব) কর্মকাণ্ড আজও জ্বলন্ত ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাসের কথা সমগ্র দেশবাসী, যারা তৃণমূলের বাসিন্দা, তারা জানতে পারেনি। তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, বিবিসি শর্টওয়েভ ও ভোয়াই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শোনার একমাত্র মাধ্যম। আর গ্রামগঞ্জের কজন মানুষের ছিল বেতার যন্ত্র।

আর পাকিস্তানি সৈন্যের ছিল গোয়ার্তুমি। তারা নিকটস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিল না ভয়ের কারণে, যদি জেনেভা কনভেনশনের কথা না-মানে। খোদ ঢাকায় আত্মসমর্পণ স্থল রমনা রেসকোর্সের কাছেই তো ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে বন্দিখানায় বঙ্গবন্ধুর পরিবার। তারাও জানতে পারেনি ঐ দিন রমনা রেসকোর্সের ঘটনা। পরের দিন ১৭ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর মেজর তারা এসে অনেক দেনদরবার করে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করান। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সৈন্য ১৭ই ডিসেম্বর ঝিনাইদহ ও খুলনা হয়ে পালিয়ে যায়। আমি তখন সেনানিবাসে এইচ. কিউতে ধৃত হয়ে বন্দি।

বরিশালের গৌরনদী কলেজের পাকিস্তানি সৈন্যের ছাউনিতে আত্মসমর্পণের খবর পৌঁছে পরের দিন মাদারীপুর থেকে যৌথ বাহিনী এলে তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আমাদের গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়ার খাদ্যগুদামে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা হেমায়েত বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের চরমপত্র পেয়েও অবস্থান ত্যাগ করেনি বা আত্মসমর্পণ করেনি। ফলে যুদ্ধের সংবাদ তৃণমূলে পৌঁছায়নি। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কজনের ছিল শর্টওয়েভ সংবলিত বেতার যন্ত্র। সংবাদ সংগ্রহের রাস্তাঘাট ছিল না বললেই চলে।

আমরা পাকিস্তান সৈন্যের আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনতে পাই ১৭ই ডিসেম্বর সকালে। জলকাদা মাড়িয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের মাঠে মানচিত্র খচিত পতাকা উড়ানো ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে। মনে পড়ে সেই দৃশ্য– মুফতি হান্নানের বাবাকে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের হত্যার অপরাধে প্রকাশ্যে কতলের রায় দিয়েছিল হেমায়েত বাহিনীর নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা। এভাবেই তৃণমূল পর্যায়ে আত্মসমর্পণের খবর ছড়ায়।

মুক্তিযুদ্ধের সেসব কাহিনি এখন বাস্তব রূপকথা মনে হয়। আর ১০/১৫ বছর পরে যখন মুক্তিযোদ্ধারা স্বাভাবিক প্রাণত্যাগ করবেন, তখন রূপকথার নায়ক হবেন তাঁরা। যাঁদের রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তার স্থপতি বা রূপকার ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খালেক বিন জয়েনউদদীন: লেখক, গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

ফিরে দেখা বাহান্ন বছর

ড. মো. নাজমুল হক

বাহান্ন বছর বয়সের একজন মানুষকে অপরিণত বলা যায় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন সরকারি চাকরিজীবী উনষাট বছর বয়সে অবসরপ্রাপ্ত হন। সুতরাং এক নদী রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাহান্ন বছর বয়সি বাংলাদেশ এখন শিশুরাষ্ট্র বা অপরিণত দেশ– এ বিবেচনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এদেশকে নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় এখন অতিক্রান্ত। এখন সময় হয়েছে কেবলই উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তোলার। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং অনেকটাই সক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু এদেশের মানুষ যে বিপুল আবেগে দেশকে ভালোবেসে উনিশশো একাত্তর সালে হাসিমুখে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বিজয় অর্জন করেছিল, সেই সমুদ্রের মতো অতল গভীর দেশপ্রেম কি এখনও বিদ্যমান আছে? এ ধরনের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয় কিন্তু প্রশ্ন তো ওঠে।

এক

বাহান্ন বছর পূর্বে চোখ ফেরালে প্রথমেই যা মনে আসে তা একটি কষ্টকর অধ্যায়। বাংলাদেশের কলঙ্কজনক ঘটনা হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার হত্যাকাণ্ড। যিনি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার বার বার প্রাণহানির সতর্কতার পরেও তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতে পারেন– ওরা আমার সন্তানের মতো। ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটল। এটা কী বিশ্বাসঘাতকতা, নাকি নৃশংসতা, নাকি প্রতিশোধ, নাকি ক্ষমতা দখলের নিষ্ঠুর পন্থা? আমরা দেখেছি, স্বাধীনতার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এক শ্রেণির পাকিস্তানপ্রেমী মানুষ, যারা স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি– সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তলে তলে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। সদ্য-স্বাধীন একটি দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ না করে তৈরি হয়েছিল বহু মত ও বহু দল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির ভিত্তি গড়ে না তুলেই সবাই চেয়েছিল নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাহিদা ও স্বার্থ পূরণের স্বল্পতম সময়ে বাস্তব ও নগদ প্রাপ্তি। বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছে মাত্র তিনটি বছর সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু সদ্য-স্বাধীন, বেপরোয়া ও অসহিষ্ণু জনগণ তাঁকে সে সময় দিতে রাজি হয়নি। দুর্নীতি, হতাশা ও স্বার্থপরতা ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপক আকারে। মুক্তিযুদ্ধের অতন্দ্রসারথিদের মধ্যেও অনেকে তৈরি করেছিলেন নানা সমস্যা ও বিরোধিতা। সৃষ্টি হয়েছিল নানা সশস্ত্র দল। সেসব গ্রুপ নিরন্তর বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিল দেশের অভ্যন্তরে। সশস্ত্রবাহিনীতেও দেখা দিয়েছিল অস্বস্তি ও বিশৃঙ্খলা। এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সমগ্র জাতি হয়ে পড়েছিল স্তম্ভিত। সাধারণ মানুষ দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকলেও বঙ্গবন্ধুর এই পরিণতির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। ফলে, সারা দেশে সৃষ্টি হয় এক ধরনের ভীতিকর অবস্থা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকারী শাসকপক্ষ সেই অচলায়তনকে করে তোলে আরও দুর্বিষহ। ২০০৯ সালে সংঘটিত 'বিডিআর' বিদ্রোহের মর্মান্তিক ঘটনা এদেশের জন্য আরেকটি বেদনাদায়ক অধ্যায়।

দুই

বঙ্গবন্ধু কি জনগণের 'পালস্' বুঝতে পারেননি বা দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হননি? এই জিজ্ঞাসার প্রথম অংশের ব্যাখ্যা হতে পারে, যিনি শৈশবকাল থেকে জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার অধিকার আদায়ে নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন, ছিলেন জনগণের মধ্যমণি হয়ে জনগণের মাঝে; ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে একটি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে যিনি স্বাধীনতা অর্জন করে দিয়েছেন; 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারে দু-দু'বার সাফল্যের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব করেছেন; পাকিস্তান গণপরিষদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তুখোর পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে, যিনি স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর একটি স্বাধীন দেশকে 'সোনার বাংলা'– আধুনিক ভাষায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তা, ছক এবং হোমওয়ার্ক করেছিলেন, তিনি জনগণের মন-মানসিকতা বুঝতে পারেননি বা বুঝবেন না, এটা অসম্ভব। আমাদের মতে, বঙ্গবন্ধু একটা নির্দিষ্ট ছকে দেশকে ধারাবাহিকভাবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অর্জন করেছিলেন কাঙ্ক্ষিত সফলতা। সে কারণেই তিন বছর সময় চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দেশকে অশান্ত করে তুলে তাঁকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছিল। বিশেষত, উনিশশো পঁচাত্তর সালের পুরোটাই ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ এক অস্থির সময়।

তিন

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের জবাবে একবাক্যে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু দেশকে সঠিক পথেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এই ভূখণ্ডটি আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি ধ্বংসস্তূপ। শত শত মাইল রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, রেললাইন, নদী-সমুদ্র-বিমানবন্দর বিধ্বস্ত বা ব্যবহার অযোগ্য; অচল ছিল ব্যাবসাবাণিজ্য; ব্যাংক, খাদ্যগুদাম ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য; সামনে ছিল প্রায় এক কোটি শরণার্থী ও গৃহহীনের পুনর্বাসন সমস্যা; বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক পুনঃস্থাপন, ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার, বিদেশি স্বীকৃতি ও সম্পর্ক স্থাপন, পাকিস্তান থেকে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিক প্রত্যাবাসন, প্রকট খাদ্য সংকট মোকাবিলা, পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের অর্থসম্পদ আদায় ইত্যাদি সহস্র প্রকার সংকট।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আকাশস্পর্শী নেতৃত্বের গুণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার কয়েকটি উল্লেখ করা যায়:

– শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন– অল্প সময়ের মধ্যে সড়ক-বিমান-নৌ ও রেল যোগাযোগ স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ।

– মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

– বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন।

– ইরান থেকে তেল নিয়ে আসেন বিনা পয়সায়।

– বন্ধু দেশ রাশিয়া থেকে আসে আধুনিক কৃষি উপকরণ।

– স্বল্প সময়ের মধ্যে আদায় করেন অধিকাংশ মুসলিম দেশের স্বীকৃতি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর ২০২৩ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করেন– পিআইডি

– সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন কৃষি খাতকে। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সম্পৃক্ত করেন কৃষি উৎপাদনে। কৃষিতে বর্তমানে বাংলাদেশের যে শক্তিশালী অবস্থান তার ভিত্তি নির্মাণ করেন বঙ্গবন্ধু। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি গড়ে তোলেন 'সবুজবিপ্লব' আন্দোলন।

– অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক-বীমা-শিল্পকারখানা এবং ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয়করণ

– মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতিকে উপহার দেন একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

– পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠন এবং কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের মন্ত্রিসভা, প্রশাসন ও পরিকল্পনা কমিশনে নিয়োগ।

– সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই অফিস-আদালত ও জাতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষা চালু করেন।

– ভূমির ব্যক্তিমালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা রাখা এবং প্রান্তিক চাষিদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের ব্যবস্থা করেন। উদ্বৃত্ত ভূমি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের বণ্টন করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জোতদার সাহেবরা রাতারাতি তাদের জমিগুলো নিজের ছেলে-মেয়েদের নামে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এমনকি, নিকটাত্মীয় বা ভূতুরে নামেও জমির মালিকানা লিখে দেওয়া হয়েছিল, যেন কোনোভাবেই সম্পত্তি সরকারের কাছে না যায়। জোতদারদের একটা বিরাট অংশ ছিলেন স্বাধীনতাবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তিকমিটির সদস্য। তাদের কাছ থেকে দেশপ্রেম প্রত্যাশা করা নিরর্থক।

– প্রণয়ন করেন যুগোপযোগী শিক্ষানীতি।

– কৃষি, ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্পকারখানা সবকিছুর সঙ্গে রয়েছে নদীর গভীর সম্পর্ক। বাংলাদেশ নদী প্রধান দেশ। ১৯৭৩ সালেই নদী খননে উদ্যোগী হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তখনই তিনি রাষ্ট্রের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বিদেশ থেকে কিনে এনেছিলেন অন্তত ৭টি ড্রেজার। সমুদ্র ও নদীবন্দর সংস্কার, নৌযান মেরামত এবং বিদেশ থেকে বার্জ-টাগবোট কেনার ক্ষেত্রে কালবিলম্ব করেননি তিনি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার গঠনের পরের মাসেই ১৯শে মার্চ তিনি অভিন্ন নদীগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে গঠন করেন জেআরসি বা 'যৌথ নদী কমিশন'। ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা থাকলেও প্রকৃত সত্য ছিল– ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে বাংলাদেশ-ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছিলেন, তাতে উল্লিখিত আছে, কোনো চুক্তিতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হবে না। পুরো ফারাক্কা নয়, মাত্র কয়েকটি জলকপাট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার জন্য ভারত বাংলাদেশের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। পরে ভারত চুক্তি লঙ্ঘন করে আর সেটা বন্ধ করেনি (শেখ রোকন, *নদী সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সারাজীবন*, সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ বসু, ২০২১ : পৃ-৩১০)

– নারী উন্নয়নেও বঙ্গবন্ধু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের মর্যাদা প্রদান ও পুনর্বাসন, নারীদের জন্য সরকারি চাকুরিতে ১০ শতাংশ কোটা, জাতীয় সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষণ, দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে ২ জন নারীকে মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ, 'জাতীয় মহিলা সংস্থা'র ভিত্তি রচনা ইত্যাদি ছিল তাঁর সুখী বাংলাদেশ নির্মাণের অসাধারণ উদ্যোগ। (ফরিদা ইয়াসমিন, 'নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু', *ইত্তেফাক*, ১৭ই মার্চ, ২০২০)।

তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাসে সেই বীজ রোপিত হয়। তবে তাঁর সমাজতন্ত্রের রূপরেখা চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ছিল না। তিনি মাও সেতুং বা মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র চাননি, চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব দেশপ্রেমিক শক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো করে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ– যার পরিকল্পনা ও দর্শন নিহিত ছিল ১৯৭৫ সালে বাক্‌শাল গঠনের মধ্যে। বিপ্লবোত্তর যে-কোনো রাষ্ট্রের মতো বঙ্গবন্ধু একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। দলমতনির্বিশেষে একটা দলীয় ফোরামে এনে তিনি এদেশে একটি সুষম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এসবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত করেন এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের। বলা বাহুল্য, মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে যা যা করণীয় তার সব কিছুই করেছিলেন।

চার

১৯৭৫-এর আগস্টের পর ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়কালটি ছিল সামরিক শাসনকাল। এ সময় রাষ্ট্রের সংসদীয় পরিচয়ের সংকট তৈরি করা হয়। রাষ্ট্রের চার মূলনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সংবিধানে যুক্ত হয় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। এর উদ্দেশ্যটি

স্পষ্ট। ৮৫-৯১ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এই জনপদে বিষয়টি যে জনপ্রিয়তা পাবে এবং ধর্মীয় কারণে কেউ এর বিরোধিতা করবে না, সামরিক শাসক তা নিশ্চিতভাবে জানতেন। পরবর্তী সামরিক শাসক নিজেকে বঞ্চিত রাখেন কেন, সে কারণে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করলেন 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'। এ সময়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহ অবাধে রাজনীতি করার অনুমতি লাভ করায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পর যে সকল ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারছিল না এবং আবারও পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিল, তারাও প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পেল। ফলে, জনগণের একটা অংশ পরিচিতি পেল স্বাধীনতাবিরোধী এবং অবশিষ্টরা স্বাধীনতাপন্থি। আমরা মনে করি, দেশাত্মবোধের অভাব, দুর্নীতি এবং বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা এই মতাদর্শগত ভিন্নতা এবং রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতারই বহিঃপ্রকাশ।

পাঁচ

দীর্ঘ সামরিক শাসনামলে দেশের একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন যেভাবে হয়, সামরিক শাসনের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাজনৈতিক দলসমূহের দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালে সামরিক শাসন থেকে বাংলাদেশ ফিরে আসে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায়।

ছয়

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাহান্ন বছরের কাল-পরিক্রমায় একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেকার অনৈক্য, অবিশ্বাস এবং পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতা। অধিকাংশ দল ক্ষুদ্র দলীয় এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ঐকমত্যে খুব কমই উপনীত হতে পেরেছেন। পরস্পরের প্রতি বিষোদ্‌গার ও বহুধা বিভক্ত মতামত বা মতবাদ হয়ে উঠেছে বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

সাত

বহু আন্দোলন-সংগ্রাম করে অর্জিত বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সর্বস্তরে প্রবর্তন বাহান্ন বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে যতটা কাগজে কলমে আছে, বাস্তবে ততটা সমীহ ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে 'ভাষা আন্দোলন' বাঙালি জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে, আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই বিপুল আবেগে ভাটার টান পড়তে সময় লাগেনি। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি, রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের সফল পরিণতির পরও পাকিস্তানি শাসক ও তার বাঙালি দোসরদের নানা ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলাভাষা তার যথার্থ অবস্থান লাভে বঞ্চিত হয়। বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তৈরি হয় বহু প্রতিবন্ধকতা। এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে পাকিস্তান আমলেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অব্যাহত থাকে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক ধারাবাহিক আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলায় ভাষণ, বাংলায় কার্যবিবরণী প্রকাশ ও বিতরণ এবং পূর্ব বাংলা প্রদেশের সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য সরকারের নিকট বার বার দাবি উপস্থাপন করেন।

করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে তাঁকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ না দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি স্পিকার ওহাব খানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি বা না জানি তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা এখানে বাংলাতেই কথা বলতে চাই। ... এমনকি ইংরেজিতেও যদি আমাদের সমান দক্ষতা থাকে। যদি আমাদের বাংলা বলার অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে আমরা হাউস পরিত্যাগ করবো। বাংলাকে অবশ্যই হাউসে গ্রহণ করে নিতে হবে– এটাই আমাদের স্ট্যান্ড। (*বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশনা-১, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮)

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে কার্যবিবরণী 'বাংলায়' বিতরণ না করায় বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি তীব্র প্রতিবাদ জানান। ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে দাবি তোলেন:

> পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে। কাজেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে, বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হোক। (আনু মাহমুদ, সম্পাদক, *গণপরিষদ ও সংসদে বঙ্গবন্ধু*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ.১২৩)

বাক্যের শেষাংশটি লক্ষণীয়, সালটা ছিল ১৯৫৬। ১৯৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারির ৪ বছর পরও এমন দাবি করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার প্রতি তৎকালীন সরকার এবং এক শ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর বাংলা ভাষাকে অবহেলা এবং উর্দু ও মুসলমানি প্রীতির ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> ভেবে অবাক হতে হয় কাজী নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে, গানের শব্দ বদল করে রেডিওতে গাওয়া হয়েছে। তারা মুসলমানী করিয়াছে। এ অধিকার তাদের কে দিল? (*ইত্তেফাক*, জানুয়ারি ৫, ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধু সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই ফেব্রুয়ারি ৭, ১৯৭২ তারিখে জীবনের সর্বস্তরে বাংলা চালুর নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও অফিস-আদালত ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও মাতৃভাষা 'বাংলা' প্রচলনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়নি। বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১২ই মার্চ ১৯৭৫ সালে কড়া ভাষায় এক সরকারি নির্দেশনা জারি করে পুনরায় সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নথিপত্র বাংলা ভাষায় লেখা ও সংরক্ষণ করার আদেশ জারি করেন। নির্দেশনায় বিদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা চিঠিপত্রের সঙ্গে ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষার অনুবাদ সংযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। এমনকি, এ আইন অমান্যকারীদের

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ার করা হয় (মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪)। ১৯৮৪ সালে সরকারি কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচি নামক পুস্তিকায় ১৯ দফা নির্দেশনা জারি করা হয় (বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেল (১৯৮৪): সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃ. ৩-৪)। ১৯৮৭ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয় বাংলা ভাষা প্রচলন আইন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি জোর করে হলেও মনোযোগ ও আগ্রহের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বাংলা না জানা এবং বিকৃতভাবে বাংলা ও বিদেশি ভাষার উচ্চারণ ও ব্যবহারে গর্ব প্রকাশ করা হয়। সর্বোপরি, বাংলা চর্চাকারীদের দেখা হয় করুণার চোখে (যা এখনও প্রচলিত)। সম্ভবত বাংলা ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্রভাষার কপালে এমন দুর্ভোগ জোটেনি। প্রত্যেক জাতিই তার মাতৃভাষা বা রাষ্ট্রভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। বাঙালি জাতিই হয়ত এর ব্যতিক্রম। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, শিক্ষিত শ্রেণির বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজের মাতৃভাষাকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। তারা সব সময় হিসাব করেন, এ ভাষা শিখে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। অথচ তারা যে কমপক্ষে একযুগ ইংরেজি ভাষা পড়ে তা শুদ্ধ ও সঠিকভাবে শেখে, তার প্রমাণ খুব একটা মেলে না। তবে অকৃত্রিম বাংলা ভাষা স্বমহিমায় বেঁচে আছে বিপুল সংখ্যক চাষি, মজুর, খেটে খাওয়া মানুষ ও স্বল্পশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে ও কণ্ঠে।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা প্রচলনে এই ব্যর্থতা আমাদের জাতিগত হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। উচ্চ আদালত ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রচলনের ব্যাপারেও কাজ করেছে একই মানসিকতা। অবশ্য একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রশাসনিক উদ্যোগ ও কোনো সুসংহত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং আর্থিক বরাদ্দ ছাড়া কেবল নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা সর্বস্তরে প্রবর্তন করা যায় না, এ বাস্তবতা যথাযথ কর্তৃপক্ষ হয়ত উপলব্ধি করেননি বা বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। ১৯৭২ সাল থেকে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য লেখক, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিকদের একটি বড়ো অংশ আমলাতান্ত্রিক 'নিস্পৃহতাকে' অভিযুক্ত করেন। যে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের এদেশের জীবনপ্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছিল, সেই ভাষা-সংগ্রামের ছিল দুটি লক্ষ্য– 'মর্যাদা' ও 'প্রবর্তন'। ১৯৭২ পূর্বকালে এ ভাষার 'মর্যাদা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু বাহান্ন বছর পরও সুনিশ্চিত কণ্ঠে দাবি করা যাচ্ছে না যে, বাংলা ভাষা স্বমহিমায় সর্বস্তরে প্রবর্তিত হয়েছে।

আট

স্বাধীন বাংলাদেশের 'সংস্কৃতি' ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে মুক্ত হাওয়া। শিল্পী ও কলাকুশলীরা বাধাহীনভাবে সব ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চায় মনোনিবেশ করতে পেরেছেন। সাধারণ মানুষ উপভোগ করছেন সংস্কৃতিজগতের সব রকম আনন্দ। কিন্তু এরপরও আমাদের নতুন প্রজন্ম কোথায় যেন বিদেশি 'কালচারেই' বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

নয়

শিক্ষাক্ষেত্রে বাহান্ন বছরের বাংলাদেশ অগ্রসর হতে পেরেছে অনেক দূর। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি সকল ক্ষেত্রেই এদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশে নিজেদের মেধার অনুকরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। এদেশের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা ও সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে দখল করে নিয়েছে মর্যাদার আসন। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেক উচ্চপদে আসীন হয়েছেন এদেশের প্রতিনিধি। বাংলাদেশ এখন কোনো দেশকে খুব একটা অনুসরণ করে না বরং অনেক দেশ অনুসরণ করে বাংলাদেশকে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের 'রোল মডেল'। স্বল্প সময়ের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে এদেশ।

দশ

বাহান্ন বছরে কী পেয়েছি আমরা? যা পেয়েছি, তা কম কীসে? নিকট অতীতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: প্রমত্তা পদ্মাকে বেঁধে বিশ্বকে অবাক করে দেওয়া আধুনিক প্রযুক্তির পদ্মাসেতু, নিজস্ব স্যাটেলাইট ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, ডিজিটালাইজেশন, স্মার্ট বাংলাদেশ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, আধুনিক বিমানবন্দর, চার, ছয় ও আট লেন বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন সড়ক, সম্প্রসারিত রেলওয়ে যোগাযোগ, বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার, উড়াল সড়ক, মাথাপিছু উচ্চ আয়, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, জীবনমান ও গড় আয়ুর বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণায় অগ্রগতি, অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের নব উত্থান ইত্যাদি। আমরা যে এখন আধুনিক ও অগ্রসর মানসম্পন্ন নাগরিকের স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করেছি– এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে প্রান্তিক নাগরিকেরাও পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহারে।

আবেগ সমুদ্রের জোয়ার বা নদীর স্রোতের মতো; যখন উত্থিত হয়, সবকিছু ভেঙেচুড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবার, জোয়ার বা ঢেউ নেমে গেলে সব কিছু হয়ে পড়ে স্তিমিত। বাঙালি চরিত্রেও এই ভাঙাগড়া বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তারা কখন আবেগে-উত্তেজনায় সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠবে আবার স্তিমিত হয়ে যাবে নিমিষে, তার হিসাব মেলানো সহজ নয়। এ অভিজ্ঞতা বিগত বাহান্ন বছরে বাংলাদেশ লাভ করেছে বার বার। একথা স্মরণযোগ্য যে, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, মুসলিম ও ব্রিটিশরা দীর্ঘদিন বাংলাদেশ শাসন করেছে। পুরো ঐতিহাসিককালটাই এদেশ ছিল পরাধীন। বাংলাদেশ প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে। একে সযত্নে লালন করা আমাদের দায়িত্ব। 'দেশটিকে নতুন করে গড়বো'– একথা বলার সময় এখন পার হয়ে গেছে। বাহান্ন বছর বয়সি এদেশের জন্য স্লোগান হতে হবে– 'আমরা উন্নয়নের পথে ক্রমাগত এগিয়ে যাবো'।

ড. মো. নাজমুল হক : প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, nazmul.brur.bn@gmail.com

মুক্তিযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্য-সংগীত

ড. সরকার আবদুল মান্নান

দেশ বিভাগের পর আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি সংকটের মুখে পড়েছিল। সেই সংকট ছিল আত্মপরিচয়ের সংকট। কারণ, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের কিছু বুদ্ধিজীবীদের আনুকূল্যে ও প্ররোচনায় এমন একটি মতাদর্শের জন্ম দিতে চেয়েছিল, যা ছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার নামান্তর। এর নাম দেওয়া যায় তামাদ্দুনিক সংস্কৃতি– জাতিগত সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে যা শুধু ধর্মীয় সংস্কৃতিকেই মান্যতা দেয়। সেই ধর্মীয় সংস্কৃতি আবার এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণির স্বার্থকে নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য উপযোগী। তার মানে, ১৯৪৭-এর পরে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল, তা না-ছিল রাষ্ট্র বিজ্ঞানসম্মত এবং না-ছিল ইসলাম ধর্মের আদর্শ অনুসারী। এমন এক পরিস্থিতিতে বিভাগোত্তর কলকাতা ফেরত ঢাকার প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীগণ নানারকম দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হন। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের জন্য তাদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি সেই দ্বন্দ্ব-উত্তরণের অস্ত্র হাতে তুলে দেয়। জন্ম নেয় ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের নতুন এক অধ্যায়। আর ঐ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একটি নতুন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি শাখার অভ্যুদয়। পরে এর নাম হয় মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, মুক্তযুদ্ধের নাটক, মুক্তিযুদ্ধের গান, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের শিল্প, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ রাতারাতি সংগঠিত হয়নি। দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমরা এগিয়ে গিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের দিকে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি অন্যায় যুদ্ধ বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দিলেও এর অনিবার্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবং ঐ অনিবার্যতার পেছনে ছিল বাঙালি জাতির বিপুল রাজনৈতিক অঙ্গীকার। অনেক চড়াইউতরাই পেরিয়ে, অনেক নেতা-নেত্রীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে শেষপর্যন্ত সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকারের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে-কোনো রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক কোনো বাঁক বদলে রাজনৈতিক অঙ্গীকারই মুখ্য। রাজনৈতিক কর্মসূচি ও আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা লাভের মতো আকাশ প্রমাণ লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জনে পরিপূরক হিসেবে যদি শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ নিরন্তর কার্যকর থাকে, তা হলে রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহজ হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, মুক্তিযুদ্ধে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, নাটক-চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিল্পীরা যে ভূমিকা রেখেছেন, তাতে প্রতিটি অধ্যায়ে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়েছে। আর তারই প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি নতুন শাখা, যার নাম মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধের শিল্প, মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি।

আমরা যদি স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কোনো শিল্পের মানুষ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি মহিমা দান করেছেন, এমন নয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল পর্যায়ের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রাম ও নৈতিক সমর্থনের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কতভাবে যে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধে কী অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে, তার কমবেশি ইতিহাস আমরা জানি। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, কারণ যে আদর্শ ও মূল্যবোধের পটভূমিতে রাজনৈতিক দর্শন তৈরি হয়, সেই দর্শন তখনই একটি টেকসই অবস্থা লাভ করে, যখন তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পৃক্ত হয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনীতি একা চলতে পারেনি, একা চলতে পারেও না। কারণ রাজনীতি যদি হয় বৃক্ষের কাণ্ড ও ডালপালা, তাহলে তার মূল হয় সংস্কৃতি। যারা সংস্কৃতির চর্চা করেন তাদের সঙ্গে রাজনীতি চর্চার কোনো পার্থক্য আছে কি না– এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, একজন লেখক, কবি, সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীর রাজনীতিবিদ হতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু উভয়ের কর্মের জগৎ এবং দায়দায়িত্বের জগৎ অনেকটাই ভিন্ন। একজন অন্যজনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করলেও এই ভিন্নতা স্পষ্ট। রাজনীতিবিদের দায় হলো প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করা, মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করা, সভা-সমাবেশ করা এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে নানা বিষয়ে দেন-দরবার করা। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের এই দায় থাকে না। যে প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিত্তি করে একজন রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক এজেন্ডা তৈরি করেন, সেই প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে ভূমিকা রাখা হলো তাদের দায়িত্ব। প্ল্যাটফর্ম হলো জনমত তৈরি করা। রাজনীতিবিদের জনমত তৈরি করার পেছনে এক ধরনের তাৎক্ষণিকতা, প্রত্যক্ষতা ও সক্রিয়তা থাকে। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই প্রত্যক্ষতা ক্রিয়াশীলতা থাকে না। একজন কবি তার কবিতার ভেতর দিয়ে মুক্তির কথা বলেন, অন্যায়-অসত্য-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। ঠিক একইভাবে একজন গীতিকার ও সংগীতশিল্পী, একজন গল্পকার, একজন কথাসাহিত্যিক, একজন প্রাবন্ধিক বিচিত্র পটভূমিতে তার ক্ষোভ ও প্রতিবাদের কথা বলেন। একজন নাট্যকার তার নাটকের ভেতর দিয়ে, একজন চলচ্চিত্রকার তার ছবির ভেতর দিয়ে, একজন সংগীতশিল্পী তার গানের ভেতর দিয়ে ঐ একই কথা বলতে চেষ্টা করেন। আর সংস্কৃতিকর্মীগণ শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির এসব উপাদান নিয়ে লোকসম্মুখে আয়োজন করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এভাবে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখা-প্রশাখা প্রকারান্তরে রাজনৈতিক আদর্শের কথাই ব্যক্ত করে। সুতরাং এই দিক থেকে দেখতে গেলে, একটি দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বড়ো ধরনের কোনো ফারাক নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এই দুই শক্তি সমানতালে কাজ করেছিল। সেই কর্মযজ্ঞের স্বরূপ-চারিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তিনটি পর্বে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি রচনায়, মুক্তিযুদ্ধকালে ও স্বাধীন বাংলাদেশে একই রকম ছিল না এবং একই রকম থাকার কথাও নয়। কারণ রাজনৈতিক পটভূমি থেকে রচিত হয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বাতাবরণ। ঐ তিন পর্বে রাজনৈতিক চরিত্রের ভিন্নতার পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মধ্যেও ভিন্নতা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান আন্দোলনের যে পটভূমির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পেছনে আমাদের এদেশের অনেক রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল। শুধু তাদের সহযোগিতাই নয়, অধিকন্তু এদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের সমর্থনও ছিল। বলা যায়, পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে এক ধরনের মোহ ছিল। ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এই মোহ থেকে তখন অনেক বুদ্ধিমান মানুষও মুক্ত হতে পারেননি। ফলে পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্যকে অস্বীকার করার কোনো জো নেই। কিন্তু দু-একজন বিরলপ্রজ দূরদর্শী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই অনুধাবন করতে পারেননি যে, রাষ্ট্র এবং ধর্ম কখনোই একসঙ্গে যায় না। কারণ, প্রথমত একটি রাষ্ট্র যে উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়, ধর্ম সেই উপাদানের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই হয় সাংঘর্ষিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে নতুন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তাই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জাতি-পরিচয় এবং হাজার বছরের পুরানো সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সবিশেষ সচেতন ছিলেন। ৭ই জুলাই ১৯৪৭ *দৈনিক ইত্তেহাদে* (কলিকাতা) তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এই কথা বলা হয় নাই যে, পাকিস্তানের বাঙালি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বালুচ, জাতিগোষ্ঠীকে তাদের জাতি-পরিচয় মুছিয়া ফেলিতে হইবে, জাতীয় ভাষা-সংস্কৃতি রচনা করিতে হইবে। আমরা পাকিস্তানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি জাতি পরিচয় ছাড়িতে পারি না এবং আমাদের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এখন যদি বলা হয়, আমাদের বাঙালি পরিচয় ছাড়িতে হইবে এবং আমাদের মাথার উপরে উর্দু ভাষা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের পূর্ব প্রান্তে আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন স্টেট প্রতিষ্ঠার দাবিতে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।' তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বে।

পশ্চিম পাকিস্তানের যে ব্যক্তিরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রকে তার আপন স্বভাবে, আপন গতিতে চলতে দেওয়া উচিত। এখানে ধর্মের খড়্গ না চালানোই উত্তম। কিন্তু তারা না-বুঝেছেন রাষ্ট্র, না-বুঝেছেন ধর্ম। ফলে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেই সংঘাত তৈরি করেছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই। দ্বিতীয়ত, মানুষের মনোগড়নে তার ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ঐ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভূমির গড়ন, আবহাওয়া ও জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাব কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন; ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক যে পটভূমিতে তারা বসবাস করেছেন, তার সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জীবন ও জগতের কোনো সম্পর্কই ছিল না। এমনকি ধর্মাচরণের মধ্যেও এই দুই জনপদের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গড়ন ছিল ভিন্ন। ফলে তাদের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। তারা মনে করেছিলেন, মুসলমান হিসেবে এদেশের মানুষ এই সিদ্ধান্তে খুশি হবেন। কারণ, তারা মনে করতেন, উর্দু ভাষা ও বর্ণ অনেকাংশে আরবির মতো, আর আরবি তো পবিত্র *কোরানের* ভাষা। সুতরাং এটা করা গেলে এদের ভেতর থেকে বাঙালিত্ব চিরকালের জন্য মুছে দেওয়া যাবে। কিন্তু সেটা তারা পারেননি।

অসাম্প্রদায়িকতা, বহুত্ববাদ ও বিপরীতের ঐকতান সৃষ্টির ভেতর দিয়ে যে গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মগুলো এই জীবনাদর্শের পরিতোষক নয়। ফলে ধর্মের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতার, বহুত্ববাদের, গণতন্ত্রের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইউরোপ থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতেই মানুষ যুগে যুগে এই সংঘাত মোকাবিলা করেছে। ঐ ইতিহাস থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোনো পাঠ গ্রহণ করেননি এবং এখনও অনেক দেশই এই শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে বিংশ শতকের মধ্যভাগে একটি আধুনিক পৃথিবীতে এসে তারা যে জীবনাদর্শ ফলিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তা ছিল অদূরদর্শিতার একশেষ। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বাধা সৃষ্টি করা, রবীন্দ্র-নজরুল থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিকাশের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা এবং সর্বোপরি এদেশের নাগরিকদের নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে নানাভাবে শোষণের পথ অবলম্বন করা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত ও ধর্মীয় নিজস্ব ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ। এ হেন পশ্চাৎপদ রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে তাদের মুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তাদের মনোগড়ন এভাবেই তৈরি হয়েছিল এবং আজও তারা ঐ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়নি। ফলে দেশভাগের সেই সূচনালগ্নে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এদেশের মানুষ জ্বলে ওঠে দ্রোহের আগুনে। আর তখনই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং জন্ম নেয় শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে নতুন এক অধ্যায়।

বাঙালিত্বের এই জাগরণের সময় থেকেই আমাদের জাতিগত উৎসবগুলো নতুন প্রাণ নিয়ে, নতুন রং ও নতুন আলো নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মনে। এসময় থেকে পহেলা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব পালিত হতে থাকে বিপুল সমারোহে। লোকসাহিত্যের কদরও তখন বেড়ে গিয়েছিল। লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র *রূপবান* বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে সাইদ-উর রহমান জানিয়েছেন যে, সাহিত্যের উপকরণের জন্য লেখকেরা দৃষ্টি দেন লোকজ জীবনের দিকে। স্থান, দোকানপাট ও শিশুদের নাম রাখার সময় বাংলা শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার শুরু হয়। সে সময় সিনেমা হলের নামকরণ করা হয়– 'বলাকা', 'মধুমিতা', 'জোনাকি' এবং উপশহরের নাম রাখা হয় 'বনানী', 'বারিধারা', 'শ্যামলী', 'উত্তরা' ইত্যাদি। আর দোকানের নাম হয়– 'সাগরিকা', 'সাগর থেকে ফেরা', 'সাগরসম্ভার'। এমনই এক পটভূমিতে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছায়ানট', ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নজরুল একাডেমি', ১৯৬৭ সালে 'ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী' এবং ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'। প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী খ্যাতিমান সাহিত্যিক সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠিত উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, সনজিদা খাতুন, সুখেন্দু চক্রবর্তী, অজিত রায়, জিতেন ঘোষ, জ্ঞান চক্রবর্তী, শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, জাহেদুর রহিম, অনিমা সিংহ, পান্না কায়সারসহ অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী উল্লেখযোগ্য। এমনই এক জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মেষলগ্নে গঠিত হয় 'গণশিল্পী গোষ্ঠী', 'সৃজনী', 'উন্মেষ', 'গণফৌজ' ইত্যাদি নামে অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন। শুধু ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে নয়, দেশের বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, মহকুমা শহর এমনকি থানা শহরকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন। সেসব সংগঠনের পরিচয় উদ্ধার করতে নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন। সেসময় সরকারের কোনোরকম অনুমোদন ছাড়াই শহিদমিনারে মঞ্চস্থ হয়– ম্যাক্সিম গোর্কির *মা*, *বিপ্লবের টুকরো ছবি*, জন রিডের *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন*, *আলোর পথযাত্রী*, *মানচিত্র*, *কালিন্দী*, *অনুবর্তন* প্রভৃতি নাটক। আর সে সময় থেকে যেসব গান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী বাঙালি মনকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিল সে সব গানের কয়েকটি হলো– 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', 'এই আগুন নিভাইবো কে রে', 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা/ আমাদের এই বসুন্ধরা', 'আজি সপ্ত সাগর উঠে উচ্ছলিয়া', 'পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে', 'ব্যারিকেট বেয়নেট বেড়াজাল/পাকে পাকে তরপায় সমকাল', 'বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রামী জান কি/ বাংলা গাছে গাছে বিদ্রোহ জ্বলন্ত তুমি জান কি', 'শান্তি না সংগ্রাম– সংগ্রাম সংগ্রাম', 'রক্ত শুধু রক্ত/ রক্ত ছড়িয়ে আছে রাজপথে ঘাটে আজি রে', 'আসাদ জোহা আর যত শহিদের/ রক্তে নিশান দেখেছি/ তাইতো মোরা সবকিছু ভুলে/ এক মিছিলে মিলেছি', 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা', 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা', 'হেই সামলো, হেই সামালো ধান হো/ কাস্তেটা দাও শাণ হো', 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ', 'ভয় কী মরণে, রাখিতে সন্তানে', 'ডিম পাড়ে হাসে, খায় বাঘডাসে', 'আমার দেশের মাটির গন্ধে/ ভরে আছে সারা মন', 'সোনা সোনা সোনা/ লোকে বলে সোনা/ সোনা নয় তত খাঁটি', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জয় বাংলা, বাংলার জয়, হবে হবে হবে হবে নিশ্চয়', 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে', 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি', 'মোদের গরব মোদের আশা', 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড়', 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', মানব না এই বন্ধনে', 'শোন দেশের ভাই ভগিনী', 'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের শুভ চিন্তা ও মননের আশ্রয়। সেসময় তাঁর অসংখ্য গান পরিবেশিত হতো এবং সেসব গানের অধিকাংশই ছিল দেশপ্রেমমূলক, জাগরণমূলক আর আশ্রয়ের। যেমন– 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে', 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'আমি ভয় করবো না ভয় করবো না', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান', 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা, নিজের অপমান', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে', 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়', 'দেশে দেশে ভ্রমি যব দুখ গান গাহিয়ে', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' ইত্যাদি। এর পরেই যার গান আমাদের চেতনাকে শানিত করে তুলত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর গানের মধ্যে ছিল– 'এই শিকল পরা ছল', 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি', 'চল চল চল', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম', 'জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যতো', 'একি অপরূপ রূপে মা তোমার', 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'কেঁদো না কেঁদো না মাগো'। এসব গান স্বাধীনতাপূর্ব আন্দোলনের উত্তাল সময়ে এবং রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের সংকটময় সময়ে বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। এসময় ছায়ানটের শিল্পীদের নেতৃত্বে একটি ভ্রাম্যমাণ গানের দল ট্রাকে করে মুক্ত এলাকাগুলোতে দেশপ্রেম ও উদ্দীপনামূলক গান পরিবেশন করে বেড়ায়। তাদের ঐ উদ্যোগ মুক্তিযোদ্ধাদের, শরণার্থীদের এবং জনগণের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তৈরি করে। একজন বিদেশি ক্যামেরাম্যানের তোলা সেসব ফুটেজ নিয়ে বহু বছর পরে *মুক্তির গান* নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। সেসময় প্রচারিত গানের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তা খুবই সামান্য। এসব গান বাঙালির চেতনায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল করে তুলেছিল। আমাদের খুব মনে হয়, স্বাধীনতা-পূর্বকালে গান ও স্লোগান মানুষকে যতটা উদ্দীপ্ত করেছিল, আর কোনো শিল্পমাধ্যম এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শুধু গান নয়, শিল্প-সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাই সে সময় নিবেদিত হয়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তির শপথে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেসব শিল্প-সাহিত্য একটি নতুন ধারার উদ্ভব ঘটায়। সেই ধারার নাম মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধের শিল্প।

ড. সরকার আবদুল মান্নান : গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, *drsharkaramannan@yahoo.com*

নারীর আত্মত্যাগে লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশ

কামরুন নাহার মুকুল

একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। গোটা জাতি তখন ঐক্যবদ্ধ। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জনতা উত্তাল, অসহযোগ আন্দোলন, সভা-মিছিলে সমবেত হয়ে পাকিস্তানি সরকারের প্রতি অনাস্থা ও ঘৃণা প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধপূর্ব প্রেক্ষাপট ও ঘটনাপ্রবাহের সংগ্রাম পরিণতি অর্জন করেছে কয়েকটি ধাপে; যার প্রতিটি ধাপে রয়েছে এদেশের নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও আত্মত্যাগ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সর্বস্তরের জনগণের যুদ্ধ। ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর এই নয় মাসে নিজেদের সাহসের, শৌর্যের, একতার পরিচয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জনযুদ্ধ। যে যুদ্ধে নারী-পুরুষ সকলেই অংশ নিয়েছে। যে যুদ্ধ ছিল মূলত নারী-পুরুষের সম্মিলিত ধারায় যুক্ত। ১৯৭১ সালের উত্তাল ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঘোষণা দিলেন, '... আর যদি একটা গুলি চলে... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'। তখন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার' কাজটিতে নারীসমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে নিরপরাধ-নিরীহ বাঙালি নরনারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাতের নিস্তব্ধ ঢাকায় চতুর্দিক থেকেই পাকিস্তানি হায়েনার দল সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে; শুরু হয় নির্যাতন, পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। সেদিন কেউই নিরাপদ ছিল না। এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশি সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্রিটিশ সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেন। ঐ ভয়াল কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়; তিনি কারাবন্দি হন পাকিস্তানে।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ও আহ্বানে যখন চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন এই ভূখণ্ডের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সর্বাত্মক ও সমানভাবে শামিল হন; যে যার মতো করে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযোদ্ধা বললেই যে চিত্রটা আসে তা হলো– আর্মস নিয়ে যুদ্ধ করা। এছাড়াও কাদা-জলে আর খোলা আকাশের তলে আত্মপ্রত্যয়ী দামাল মেয়েরা প্রশিক্ষণ নেয়; সাহসের সাথে নারীরাও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন। নারীসমাজের ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক। নারী সমরে ছিল, ছিল নেপথ্যের শক্তি-সাহসে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ঈর্ষণীয়, যা ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের অবদান ছিল গৌরবদীপ্ত, বীরত্বপূর্ণ। কেউ বন্দুক হাতে, কেউ আশ্রয় দিয়ে, কেউ খাবার সরবরাহ করে, কেউ আহতদের সেবা করে, আবার কেউ গান গেয়ে, খবর পাঠ করে এবং গোপনে তথ্য সরবরাহ করে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন পরোক্ষভাবে। এভাবে অস্ত্র ছাড়াই নানাভাবে যুদ্ধ করেছেন নারীরা। শিক্ষিত নারীর পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ নারীরাও এ যুদ্ধে সক্রিয় ও সাহসী ছিলেন। এই সাহসী নারীরাই ৯ মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অতীতের নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্পৃক্ততার ধারাবাহিকতায় নারীরা নানা ভূমিকা রেখেছেন। মা ছেলেকে, বোন ভাইকে, স্ত্রী স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে সঙ্গী হয়েছেন। গ্রামবাংলার মায়েরা নিজের ছেলেদের যুদ্ধে যেতে সাহস জুগিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া অথবা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও চিকিৎসা করা, তাঁদের জন্য ওষুধ, খাবার এবং কাপড় সংগ্রহ করা– রক্ত ঝরা একাত্তরে নারীদের এই সক্রিয় কর্মকাণ্ডই ছিল তাঁদের যুদ্ধ। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশটির সিংহভাগ করেছিলেন নারীরা। তাঁরা এই ভূমিকা পালন করেছিলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, চরম নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা নিয়েই। যাঁরা হাতে অস্ত্র তুলে নেননি, তাঁরা দিয়েছেন সেবা। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়েছেন। নারীদের সাহায্য সহযোগিতায়ই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকেই নারীদের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অদম্য সাহস আর উদ্দীপনা নিয়ে তাঁরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। বিশেষ করে যুদ্ধে গেরিলা নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা সংগ্রামী নারীসমাজে আজও প্রেরণার উৎস। বেগম ফোরকানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল প্রথম গেরিলা স্কোয়াড। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'– স্লোগানকে বুকে ধারণ করে নারীরা বিভিন্ন গেরিলা অপারেশনে নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেছেন। এই গেরিলা অপারেশনগুলোতে দুর্দমনীয় নারী সৈনিকেরা তাঁদের প্রমাণ করেছেন যথেষ্ট চৌকসতা এবং নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের গোবরা ক্যাম্পে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অনেক নারী। শরণার্থী

শিবিরে ডাক্তার, নার্স এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেবা দিয়েছেন অনেকে। বীরকন্যা প্রীতিলতার পথ অনুসরণ করে চট্টগ্রামের নারীসমাজের মিছিলের একমাত্র স্লোগান ছিল, 'মা-বোনেরা প্রীতিলতার পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'মা-বোনেরা ঘর ছাড়ো, প্রীতিলতার পথ ধরো'। রমা চৌধুরী, সীমা চক্রবর্তী, প্রান্তিকা চক্রবর্তী, ডাক্তার রেণুকণা বড়ুয়া, ডাক্তার শামসুন্নাহার কামালের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি, কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোবলকে উদ্দীপ্ত করতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি বেতার কেন্দ্রের সূচনা সংগীত হিসেবে প্রচারিত হতো। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্য ছিলেন; তাঁদের অনেকেই কণ্ঠসৈনিক ছিলেন। কণ্ঠসৈনিকরা ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন। তাঁদেরও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। তাঁদের কণ্ঠের গান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছে; প্রেরণা দিয়েছে সাধারণ মানুষকেও। তাঁদের কণ্ঠে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জয় বাংলা বাংলার জয়' এরকম অসংখ্য কালজয়ী গান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের সময়ে প্রতিদিন মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অপেক্ষা করত। মুক্তির গান তথ্যচিত্রে এর প্রমাণ মেলে। যেসব গুণী নারী শব্দসৈনিক স্বাধীনতার পক্ষে গান গেয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁরা এখন বেতার ও টিভি শিল্পী হিসেবে খ্যাত। সে সময়ের অনেক দেশের গান এখনও বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন। আবার কোনো কোনো নারী মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন, জনমত গঠন করেছেন। নানামুখী ভূমিকা নিয়ে নারীরা মুক্তির সংগ্রামে ছিলেন অদম্য।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ উভয়েই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই জনযুদ্ধে নারীর কৃতিত্বের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির পাশাপাশি ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন খেতাব দিয়েছেন। তার মধ্যে বীরত্বব্যঞ্জক পদকধারী নারী তিনজন। বীর প্রতীকের একজন হলেন– মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, একজন মেডিকেল কোরের চিকিৎসক ক্যাপ্টেন সিতারা এবং অন্যজন কাঁকন বিবি ওরফে নূরজাহান বেগম। মুক্তিযুদ্ধে নারী শক্তির অন্যতম নাম তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কুড়িগ্রামের রাজীবপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে রাঁধুনী হিসেবে যোগ দেন। রাজীবপুর ওয়ার ফিল্ডে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজটি করেন এ গেরিলা। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের জোগান দেওয়া থেকে শুরু করে ২০টিরও বেশি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এরা মূল্যায়ন পেলেও অন্য নারীরা কিন্তু মূল্যায়ন পাননি। পিরোজপুরের অসীম সাহসী এক নারী মুক্তিযোদ্ধার নাম ভাগিরথী। যিনি দেশের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও পাননি শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি। তারই মতো বরিশালের ঝাউতলার দুর্গাও স্বীকৃতি পাননি। বিথীকা বিশ্বাস এবং শিশির কণা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের গানবোট গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দিলেও যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাঁরা যথাযোগ্য বীরের মহিমায় অভিষিক্ত হননি; বরং তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিল সামাজিক লাঞ্ছনা। যুদ্ধ শেষে তাঁদেরকে পরিবার ও সমাজ গ্রহণ করেনি। চট্টগ্রামের রমা চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন; যুদ্ধের পর তাঁরও স্বামীগৃহে ঠাঁই মেলেনি। যুদ্ধ পরবর্তী সমগ্র বাংলাদেশে এমন উদাহরণ অসংখ্য। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকাতেও শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন এবং শহিদ কবি মেহেরুন্নিসার নাম খুব বেশি উচ্চারিত হয় না। এদের মতো অসংখ্য নারী দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন; অসংখ্য নারীর আত্মত্যাগ ও সাহসী ভূমিকার কথা অনেকটা ইতিহাসের আড়ালেই রয়ে গেছে। ক্যাম্পে আটক থাকা একজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার মতো একজন নারী যোদ্ধাও একইভাবে শারীরিক, মানসিক চরম নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু পরবর্তীতে পুরুষযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেও নারীকে দেওয়া হয়নি মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি। বরং তাঁদের অপবাদ দিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিলেন স্বাধীনতার মতো একটি বড়ো অর্জনে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তাঁর জীবন বাজি রাখার ঘটনা। শহিদের একটি বড়ো অংশই নারী। প্রতিক্ষণেই ছিল তখন নারীর যুদ্ধ।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সমগ্র জাতি গভীর সংকটের মোকাবিলা করেছেন। তখন নারীরা দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পশু সৈন্যদের নারী ধর্ষণ ও হত্যালীলা মানবসভ্যতার সব যুগের সব নজিরকে ম্লান করে দিয়েছে। সেই মানবতাবিরোধী অপরাধে তাদের সহযোগিতা করেছে এ দেশেরই ঘাতক রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী। সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে অসংখ্য বাঙালি নারীকে ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রী থেকে শুরু করে দিনমজুরের স্ত্রী-কন্যারাও তাদের পাশবিক ক্ষুধার শিকার হয়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, অনেকে শহিদও হয়েছেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশে সংঘটিত নারী ধর্ষণের লোমহর্ষক কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। এই নরপশুদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতায় বিশ্ববিবেক ঘৃণায় আতকে উঠেছিল। কিন্তু বিজয়ের পর যুদ্ধটি পরিণত হয় পুরুষের যুদ্ধে, পুরুষের বীরগাথায়। নারীর যুদ্ধ, নারীর আত্মত্যাগ, নারীর বীরত্ব রয়ে যায় চোখের আড়ালে। মুক্তিযুদ্ধে যে নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা যে নির্মম নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন তা একাত্তরের নারী নির্যাতনের ওপর বহুলালোচিত গ্রন্থ *এগেইনস্ট আওয়ার উইল: মেন উইমেন অ্যান্ড রেপ* গ্রন্থে আন্তর্জাতিক গবেষক সুজান ব্রাউনমিলার বাঙালি নারী নির্যাতনের সঙ্গে জাপানি সেনাদের দ্বারা নানজিং ও জার্মানদের হাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় সংঘঠিত ঘটনাবলির তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, সর্বমোট চার লাখের মতো নারী পাকিস্তানিদের হাতে ধর্ষিত হয়েছেন ৯ মাসে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধে আড়াই লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। কিন্তু ওয়্যার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি তাদের গবেষণায় বলছে, এ সংখ্যা ৪ লাখ ৬০ হাজার। এমনকি ৯ মাসে যে ৩০ লাখ বাঙালি গণহত্যার শিকার হয়েছে,

তার ২০ শতাংশই নারী। নির্যাতনের ধরন ছিল বর্বরোচিত। একাত্তরে যে সাড়ে চার লাখ নারীর ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়, তার ধরন ছিল অমানবিক। ঘাতকরা কেবল নির্যাতন বা ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ৭০ শতাংশ ধর্ষিতার সামনে হত্যা বা নির্যাতন করা হয়েছে তাঁদের স্বামী বা নিকট আত্মীয়কে। নির্যাতিত নারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারীকে স্পট ধর্ষণ ও স্পট গণধর্ষণ করা হয় এবং ১৮ শতাংশ নারীকে কারাগারে ও ক্যাম্পে নির্যাতন করা হয়েছে। গবেষণায় আরও বলা হয়, নির্যাতিত নারীদের মধ্যে বিবাহিত ছিলেন ৬৬ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং অবিবাহিত ৩৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। ভারতে আশ্রয় নেওয়া নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হিন্দু নারীদের মধ্যে কুমারী বা অবিবাহিতা ছিলেন ৪৪ শতাংশ। এঁদের অধিকাংশই আর দেশে ফেরেননি।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের ভূমিকাও ছিল ঐতিহাসিক। শহিদ রুমীর মা জাহানারা ইমাম এবং শহিদ আজাদের মা সাফিয়া বেগমের মতো অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। এভাবে নারীরা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে অদম্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাজ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পে রান্নার কাজ অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরী হিসেবেও কাজ করেছেন তাঁরা। কবি সুফিয়া কামাল পাকিস্তানি বাহিনীর নজরদারিতে যুদ্ধের ৯ মাস ঢাকায় তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। ওই অবস্থায়ও তিনি নানা কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন।

৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত আর ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া এই প্রিয় বাংলাদেশ। নির্যাতিত এই নারীরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসই নির্যাতিত হননি বরং যুদ্ধের পরও তাঁরা অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। এই আত্মত্যাগীদের রক্ত পুরুষের রক্তের পাশাপাশি মিশে আছে আমাদের প্রিয় লাল-সবুজ পতাকায়। যে নারীদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলো, তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অত্যাচারিত নারীরা এ সমাজে যখন নিগৃহীত-নিপীড়িত হতে থাকেন, তখন তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সত্যিকারের পিতার ভূমিকায় থেকে তিনি বলেছেন, 'আজ থেকে পাকবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত মহিলারা সাধারণ মহিলা নয়। ধর্ষিতা মেয়ের বাবার নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দাও। আর ঠিকানা লেখ ধানমন্ডি ৩২। মুক্তিযুদ্ধে আমার মেয়েরা যা দিয়েছে সেই ঋণ আমি কীভাবে শোধ করব ?' ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরশ্রেষ্ঠ, বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা নারীদের জন্য দিয়েছিলেন বীরাঙ্গনা খেতাব। যার অর্থ সাহসী নারী বা যুদ্ধের নায়িকা। নারীদের আত্মত্যাগের জন্য তাঁদের সম্মান জ্ঞাপনে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। '২৬শে ফেব্রুয়ারি বীরাঙ্গনা দিবস'। পরবর্তীতে এই বীরাঙ্গনা গৌরবের উপাধিটা হয়ে ওঠে অপমানের। নারীরা সম্মানের বদলে পেয়েছেন কেবল কটূক্তি, বঞ্চনা ও গঞ্জনা। এই উপাধি যেন লজ্জার। আমাদের ইতিহাসে এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমাগুলোতে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি তথা বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে এর অর্থ দাঁড়ায় কেবল ধর্ষিতা। বীরাঙ্গনা নারীরা পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলেন। সমাজের কাছে যেন তাঁদের আর কোনো চাওয়া-পাওয়া রইল না। নিয়তির কাছে সঁপে দিয়েছেন নিজেদেরকে। ড. নীলিমা ইব্রাহিমের *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* বইয়ে বিভিন্ন কেস স্টাডিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক রিজিয়া রহমান তাঁর *রক্তের অক্ষরে* উপন্যাসে নারীর জন্য প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার ছবি এঁকেছেন পরম মমতায়।

সর্বোচ্চ সম্পদ নিজ সম্ভ্রম হারানো মা-বোন এবং যুদ্ধশিশুরা যে রক্তাক্ত বেদনা বয়ে চলেছেন তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি অবিচ্ছেদ্য সত্য। মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষণের পরিণতিতে যে নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন, এসব যুদ্ধশিশুকে দত্তক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়ামসহ নানা দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কতজন যুদ্ধশিশুকে এভাবে দত্তক হিসেবে দেওয়া হয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট রেকর্ড নেই। একটা বুলেট একজনকে একবারই হত্যা করে। কিন্তু যুদ্ধকালীন 'সম্ভ্রম লুণ্ঠন' বুলেটের চেয়েও শক্তিশালী এক অস্ত্র। এই ঘৃণ্য ভয়াবহ অস্ত্রটি সম্ভ্রম হারানো নারীকে জীবনভর হত্যা করে চলেছে। আর যেসব যুদ্ধশিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে তারাও ওই নির্মমতার সেকেন্ডারি ভিকটিম। তাদেরকেও নিরন্তর বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অবহেলা, হতে হয়েছে সামাজিকভাবে নিগৃহীত।

কবি সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিমসহ বিভিন্ন সমাজ সেবকের উদ্যোগে সরকারি পর্যায়ে যুদ্ধাহত নারীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিরাজগঞ্জ জেলার ৩০ জন বীরাঙ্গনাকে সাথে নিয়ে একই মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁদের 'মা' ডেকেছিলেন তিনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আশ্বাসও দিয়েছিলেন ভাষণে। **বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখা কবিতায় 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর'– এভাবে নারীকে মহীয়ান করেছেন। আর স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনের দ্বারা নারীকে মহীয়ান করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৮ই ফেব্রুয়ারি নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন এবং সচেতনভাবে নারী-পুরুষের সমতার জায়গাটা নিজ দক্ষ প্রশাসনিক চিন্তায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।**

পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেল, বিজয় এনে দিলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর রক্তাক্ত বাংলাদেশের অনেক নারীই যুদ্ধকালীন সময়ে হারিয়েছেন তাঁদের নিজেদের পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যকে, যেমন- বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলেকে। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরোচিত হামলায় কোনো পুরুষ জীবিত না থাকায় দেশের অনেক গ্রাম পরিচিতি পেয়েছিল 'বিধবার গ্রাম'। তখন সংসারের হাল ধরেছিলেন এই মহান এবং সাহসী নারীরাই। সংসারের পুরো দায়িত্ব ছিল তাঁদেরই কাঁধে। সম্ভ্রম হারানো এই নারীদের কষ্টগাথার কথা অদৃশ্য হয়ে গেছে অনেকটা। মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে জন্ম নেওয়া বর্তমান প্রজন্ম জানুক একাত্তরের নির্যাতিত নারীদের কথা; হৃদয় দিয়ে অনুভব করুক তাঁদের নির্যাতিত হওয়ার যন্ত্রণা। 'কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে, কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।'

কামরুন নাহার মুকুল: নাট্যকার ও ফিচার রাইটার, showmikhasan15@gmail.com

ফসলে শিলাপাত

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

এক সময় আমার নিজের জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। এই প্রশস্ত লোমশ বুকের ভেতরটাকে মনে হতো, উর্বরা একখণ্ড গৈরিক জমির মতো। সেই জমিটুকু চাইত শ্রাবণের ধারায় সিঞ্চিত হতে। কখনো শরতের ঝরা শিউলিতে ডুবে থাকতে।

তখন সব কিছুই আমার পাগলের মতো ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। এই শ্যাওলা সবুজ দিঘির জল, ঈষৎ বিস্কুট রঙা শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি আর পরিপাটি করা মাঠের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রাবণ– সব কিছুই পৃথিবীর আশ্চর্য উপহার বলে মনে হতো।

আজ আবার অনেকদিন পর সেই ভালোলাগা মন যেন ফিরে পেয়েছি। নিজেকে মনে হচ্ছে যুগন্ধর শিল্পী গাইয়ার মতো। গাইয়া যেমন মাহাকে তার চিত্রে অক্ষয় করে রেখে গেছেন, আমিও তেমনি হেনার জীবনপাত্র সৌন্দর্য আর সুধায় পরিপূর্ণ করে তুলতে চলেছি। তাকে আমি সুন্দর করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব।

হেনার বিয়ে আজ। সাধারণ ঘরের প্রতিভাদীপ্ত একটি ছেলের সঙ্গে। আমি বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার করে যা এনেছি, তা সামান্যই। এ হেনার বিয়ের আনন্দোৎসব নয়। এ তাকে পরিপূর্ণ করে তোলার আমার নিরলস সাধনা। হেনা তার স্বামীর সংসারে ফসলের পূর্ণতায়, কুসুমের সৌগন্ধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

কিন্তু এ সাধনা আমার অনেক দিন আগের। ছোটো ভাই বাবুন, বোন হেনা আর আম্মাকে নিয়ে সাধারণভাবে সুখী হওয়ার সাধনা।

তখন আমি টিকাটুলীর একটি মেসে থাকতাম। চাকরিবিহীন নিরস জীবন। সকালে, সন্ধ্যায় দুটো টিউশনি সম্বল করে ঢাকায় হুঁশহুঁশিয়ে চলা বাসের ভেতর ঢুকে পড়তাম। আমরা পাঁচজন এক বিরাট ফ্ল্যাটের একটি কামরা নিয়েছিলাম। পেছনে ছোট্ট একচিলতে জায়গায় রান্নার ব্যবস্থা ছিল। পাশেই বাথরুম।

শুক্রবারে আমার ছাত্র পড়ানো ছিল না। সহকর্মীদের ছিল না আপিস। ঐ দিন সারা হপ্তার কাপড় কাচা, ঘরদোর কিছুটা গোছগাছ করতাম। আমাদের দু'বেলার ঝি ছিল ময়নার মা। সে ঘর ঝাঁট দিত। বাটনা বেটে রান্না করত। আমাদের দু'একটা ফাইফরমায়েশ খাটত। ময়নার মা হাসত, কথা বলত। বলতে বাধা নেই, তার দেহের সুস্পষ্ট খাঁজগুলো দেখতে আমার ভালোই লাগত।

একদিন বাদলার দিনে ময়নার মা ভুনা গোশতের জন্য বাটনা বাটছিল। গায়ে জ্বর ছিল বলে সেদিন আর বেরুইনি। আমার সেই জ্বর ঘোরে পড়ে থাকা দুটি ঘোর চোখে ময়নার মায়ের থলোথলো বুক নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল।

তবু নারী দেহের এসব শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে খুব বেশি একটা ভাবতাম না। দেশে তখন বিধবা মা, বোন, আর ছোটো ভাইটির চিন্তায় অধীর হয়ে উঠতাম এক এক সময়। ছোটো ভাই বাবুন সারাদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলত, ঘুড়ি ওড়াত। পড়াশুনার ধার ধারত না। অথচ অভিভাবক বলতে আম্মা, তিনি সারাদিন বকাঝকা করতেন। মারধোর করতেন। অসহিষ্ণু হয়ে চিঠি লিখতেন ঘন ঘন।

এক এক সময় নিজেকে ভীষণ অদৃষ্টবাদী মনে হতো। ভাগ্যের প্রতি বিরক্তি জাগত। আব্বা বেঁচে থাকলে ঐ সব ঝামেলা আমায় পোহাতে হতো না।

দেশে তখন নানা অসন্তুষ্টি। আমিও নানা হতাশায় ভুগছি। যখন ভার্সিটিতে ছিলাম তখন বুকভরা স্বপ্ন ছিল। সত্যি ঐ বয়সে কী বোকাই না থাকে মানুষ। জীবন যে এত সমস্যাপীড়িত তা কোনোদিনও ভাবিনি। ভাবতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রি সসম্মানে পাস করার পরও এরকম এক বেকার জীবন বা সাদামাটা মেসের রুদ্ধ পরিবেশে গতানুগতিক জীবন কাটাতে হবে কোনোদিন তা ভাবিনি। নিজের নিজস্ব একটা রুচি ছিল একদিন। ছিমছাম ও সাদাসিধে পরিচ্ছন্নতা এককালে খুব পছন্দ করতাম। এখন সেই আগের আমি আর এখনকার আমি কত তফাৎ।

এখন 'চেইন স্মোকার' আনিসের অজস্র সিগারেটের টুকরোতে ঘর ভরে যায়। নাকে তামাকের উগ্র ঘ্রাণ। বিছানার চাদরে ধুলো উড়ে। কিন্তু এসব আর এখন খারাপ লাগে না।

সারা দিনরাত চাকরির ভাবনা আমাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে। যে দু'চারটি টিউশনি করি, তার মাঝে সন্ধ্যেবেলারটাই মোটামুটি ভালো। সেটাই সারাক্ষণ আমাকে অমোঘ আকর্ষণে কাছে টানে।

ক্লাস ফাইভের ছেলে অন্তু। সে আমার ক্ষুদে ছাত্র। তাকে পড়াতে পড়াতে চকিতে দেখি ফর্সা দুটি পা, হালকা চুড়ির রিনিঝিনি ঝংকার শুনে আমি মাঝে-মধ্যে আনমনা হয়ে যাই। তার হাতের পরিপাটি করা নাশতার মাঝেও অনাস্বাদিত স্বাদ মিলত।

মেয়েটির নাম লীনা। এই লীনাকে আমি মনে মনে ভাবতাম। সারাক্ষণ। কল্পনায় আমি ওর হাত ছুঁয়ে রোমাঞ্চে শিহরিত হতাম। মনের স্থির সরোবর তার চৌদিকের শক্ত-মজবুত বাঁধন ভেঙে কলকলিয়ে ছলছলিয়ে ছুটত। সেই নদীর রস পিয়ে আমি নিজেকে মাতাল ভাবতাম।

অথচ তার ছোটো ভাই কেমন পড়ছে, বাড়িতে একদম পড়তে চায় না, বেজায় দুষ্টুমি করে সারাদিন– এসব মামুলি দু'একটা কথা ছাড়া ওর সাথে আমার কোনো কথাই হতো না। তার সেই নিঁখুত চিকন দেহের বাঁধন, অজগর সাপের মতো মোটা-বিনুনি, হাত দিয়ে আমার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করত। দুটি ভরা ভরা মেদুর চোখের বিষণ্নতায় স্নাত হতে ভারি ভালো লাগত।

এই বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এলে দুটি বিপরীতধর্মী আবেগে আমি পিষ্ট হতাম। একদিকে লীনার আকর্ষণ, আর অন্যদিকে সম্পূর্ণ মানবিক গুণাবলী বর্জিত লীনার আব্বা মেহমুদ সাহেব। তার বিরাট বপুতে যেন, 'মানি ইজ লাইফ' কিম্বা 'মানি ইজ সুইটার দ্যান হানি'– এ সমস্ত অদৃশ্য লাইনগুলো খোদাই করা থাকত। তাই তার সামনে এলেই কেন্নোর মতো গুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে হতো আমার।

একদিন ওরা এক বিয়ের দাওয়াতে গেছে। আমি সেই নির্জন বাড়িতে ঢুকে মেহমুদ সাহেবের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। 'ব্ল্যাক ডগ' হুইস্কি সামনে নিয়ে বসেছেন। কাছে বেঁটে গ্লাস। চোখ দুটো ঘোর লাল। চেঁচিয়ে উঠেন তিনি।

– হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম? কোথা থেকে এসেছ?

– আমি রফিক। অন্তুর মাস্টার।

– যাও, যাও। অন্তু বাড়ি নেই, গেট আউট– আই সে গেট আউট।

তার এই নির্দেশিত অঙ্গুলি হেলনের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে গেলাম। সমাজের এই মহিমান্বিত লোকেরা চিরদিনই তো অমনি করেই এই মধ্যবিত্তসমাজকে অঙ্গুলি হেলনে স্থান নির্দেশ করে দিয়েছে। *রামায়ণের* সীতার সীমিত গণ্ডির মতো এঁকে রেখে গিয়েছে একটি বৃত্ত। এর বাইরে যাবার আর উপায় নেই তাদের।

আমরা শুধু প্রজ্ঞা দেব তাদের সন্তানদের। বিদ্যায়, শিক্ষায়, গুণে, গরিমায় সমাজ আর জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে ওরা। সাহিত্য, কলা আর বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী হবে ওরা। আর পঞ্চপ্রদীপের সবটুকু আলো অন্য দীপাধারে ঢেলে দিয়ে যারা হয়েছে রিক্ত, যাদের হৃদয়ের আলো গিয়েছে নিভে, তারা আপন অমার আঁধারেই ডুবে থাকবে চিরদিন।

সেই রাত থেকেই আমি তাকে ঘৃণা করতে শিখলাম। অথচ লীনার জন্যে আমার বুকে এক সাগর ভালোবাসা সংগুপ্ত ছিল।

লীনা, তুমি কোনোদিন আমার সঙ্গে ভালোবাসার কথা বলোনি। আমিও তোমার সামনে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে কোনোদিন উন্মোচিত করতে পারিনি। তবু আবেগ বিহ্বল হৃদয়ে সারাক্ষণ শুধু ভেবেছি, লীনা শুধুই আমার।

দেশে তখন নির্বাচন। চারদিকে দারুণ হইচই। গণজীবনে আলোড়ন জেগেছে। সব বাঙালি এক একজন দেশপ্রেমিক। মাঠে-ঘাটে, ড্রয়িংরুমে, মেসের আড্ডা– সবখানেই যেন রাজনীতির মহড়া চলছে। সবাই জানতে চাইছে- 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'

তারপর এলো পঁচিশের কালোরাত্রি। ভয়াবহ শব্দ আর তীব্র আর্তনাদে আমাদের পাঁচ জনের চোখে ঘুম এলো না। বুকে চাপা কান্না পাথরের চাঁই এর মতো চেপে বসেছে। জানালার ফোঁকর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কি হতে চলেছে। শুধু আবছা ধোঁয়া, আগুনের লেলিহান শিখা আর অসহায় আর্তনাদ—সব কিছু মিলে তখন মনে হচ্ছে, আমি বিদেশি কোনো ফিকশনের ছবি দেখছি। ঘুমহীন সেই ভয়াবহ রাত শেষে আমি ছুটে গেলাম লীনাদের বাসায়। দেড় বিঘা জমির ওপর সেই বাড়িটি স্থিতধী হয়ে আছে।

লীনাও সারারাত ঘুমোয়নি। তার দুটি বিষণ্ন চোখ তারই সাক্ষ্য দিলো। শুকনো মুখ।

– রফিক, ভালো আছ?

লীনা, এই প্রথম আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করল। কাছে এগিয়ে এলো। আমার হাত দুটো আঁকড়ে ধরে রইল খানিকক্ষণ। এক সময় আমি নিঃশব্দে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম।

মেসের দিনগুলো তখন অসহ্য ঠেকছে। আম্মা, হেনা, বাবুনের জন্যও চিন্তা হয়। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে যে যোগাযোগ করব সে সুযোগটা করতে পারছিলাম না। পাকিস্তানি সেনাদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনি কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

শিরায় শিরায় তখন আগুন জ্বলছে। আমি মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিলাম। মৃত্যুভয় তখন একেবারে ছিল না। মৃত্যু লক্ষ যোজন দূরে দাঁড়িয়েছিল। চোখের সামনে ভাসত, শৃঙ্খলিত বাংলা মায়ের ছবি। বাংলার শ্বেতচন্দনের মতো জোছনার গায়ে কে যেন রক্তচন্দনের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে।

ক্যাম্পে অসহনীয় পরিশ্রম করে শরীরটাকে মজবুত করলাম। যুদ্ধের ট্রেনিং নিলাম। বন্দুক চালাতে শিখলাম অব্যর্থ নিশানা করে।

অজানা, অচেনা গাঁয়ে পাড়ি দিতে লাগলাম। এর মধ্যে সুযোগ করে আম্মা, হেনাদের চাচার কাছে দিয়ে এলাম। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আম্মা আর হেনা বিদায় দিলো। হাতের কঠিন তালুতে চোখের পানি মুছে কত হরিমতী, কত কলিমন বিবি এগিয়ে দিলো খাবারের থালা। নাকে নথ পরা কিশোরী বোনদের চোখ, হরিণীর মতো ভীরু দৃষ্টি। তাদের লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ আমার একফোঁটা বুকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ভালোবাসায়-আনন্দে আমি শিহরিত হই। গুনগুন করি। ওদের মুখে হাসি ফুটাতেই হবে।

তারপর দিনের পর দিন সেই শীতল বাংকারে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য লুকিয়ে রইলাম। কখনো গোপন খবর অনুযায়ী খান সেনাদের বিরাট কোনো দলের অবস্থানের খবর শুনে হাত বোমা নিয়ে ছুটতে হয়েছে। এই জীবনমরণ-পণের মাঝে বুকে জন্ম নিয়েছে অনাগত, অদেখা স্বপ্নের মতো– বাংলাদেশ। হিমশীতল বাংকারে বসেও অনুভব করতাম, নেবু ফুলের সোঁদা সুঘ্রাণ, শ্যাওলা-সবুজ জলের বুকে গুন্ঠিত শাপলার কুঁড়ি। কান পেতে শুনতাম ঢেঁকিঘরের ছন্দ। বুকের ভেতরের জীবন্ত সবুজ বাগানে দল মেলতো সিক্ত কদম কোরকটি।

তখন আর কোনো দুর্বলতা মনে ঠাঁই পেত না। বন্দুকের ট্রিগার চেপে ধরতাম। রুদ্ধশ্বাসে। লুটিয়ে পড়ত অনেক রক্তাক্ত দেহ।

সেই লালিম দ্যুতির মাঝে দেখতে পেতাম, শৃঙ্খল খুলে যাচ্ছে আমার বাংলা মায়ের। নবনীত দেহের বন্ধন মুক্ত হতে চলেছে। সুখের ঢেউ আছড়ে পড়ত বুকে– সেই মুহূর্তে।

তবু আচমকা মনে পড়ে যেত হেনার কথা। মায়ের কথা। লীনার কথা। সেই প্রথম স্পর্শ। সেই শেষ স্পর্শ। বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে আসত। বেদনায় পরিপ্লাবিত অন্তরজুড়ে শুধু অদম্য এক কামনা। বাংলার গলায় চেপে বসা শক্ত নখরের টুঁটি আমি সরিয়ে ফেলব। লাশের পর লাশের স্তূপ জমে উঠল। সবুজ ঘাস, গৈরিক মাটি ভিজে গেল রক্তের লোহিত কণায়। শত শত আলোর পাখি হয়ে আমরা তখন ছুটে চলেছি আলোর সাগর পেরিয়ে।

স্বাধীন হবার পর ঘরে ফিরে এলাম। বাঁ হাতখানি বিসর্জন দিয়ে এসেছি রণক্ষেত্রে। তার জন্য কোনো খেদ নেই। ক্ষোভ নেই। কিছু পেতে হলে কিছু হারাতেও যে হয়।

লীনাদের সেই বাড়িটিতে সব আছে। শুধু লীনা নেই। সে হারিয়ে গেছে। দেখলাম, আমাদের চির পরিচিত প্রাণখোলা, দিলদরিয়া মানুষ ফারুক ভাই আর নেই। ইউনিভার্সিটি চত্বর কেমন যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। মুনীর স্যার নেই। তিনি তাঁর রক্তাক্ত প্রান্তরে হারিয়ে গেছেন।

অজস্র বাংকারের হিমশীতল তলদেশ থেকে বের হলো অজস্র উলঙ্গ, বীভৎস আর সদ্যমৃত নিষ্পেষিত নারী শরীর। কারোর কপালের কুমকুমের টিপ এখনো ম্লান হয়নি। বোজা চোখের পাতায় কাজলের রেখা। পরনের নিভাঁজ শাড়ির কুচিগুলো এখনও সাক্ষী দিচ্ছে মাত্র দু'চারদিন আগেও ওরা ছিল কারোর ঘরনি, কারোর কন্যা, সন্তানের জননী। যন্ত্রণাকাতর মুখগুলো দেখে দেখে আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আসছিল। সারা বাংলাদেশজুড়ে ঐ দুর্ভাগিনীদের এক একজন যেন লীনার প্রতিভূ।

দেখে চলেছি আমি মৃত্যুর রূপ। সিনেমার স্লাইডের মতো ভেসে ওঠে একের পর এক ছবি। কী আদিম বীভৎসতা! বুকে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। নিজের শব ব্যবচ্ছেদ যেন আমি নিজেই করে চলেছি। চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। ঝাপসা হয়ে আসে আমার বাংলার ছবি, আমার চোখের অশ্রুতে।

আম্মা চোখ মুছে বলেন, তোর হাতটি যে সারা জীবনের জন্য বেকার হয়ে গেল।

– তাতে কী হয়েছে? স্বাধীনতা কি এমনি পাওয়া যায় আম্মা?

মা হেনার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ভারি দুঃখ হয় ওর কথা মনে হলে। ন'মাসের বীভৎসতা দেখে হেনা যেন কেমন হয়ে গেছে। চুপচাপ হয়ে গেছে। কথা বলে খুব কম।

তার মানসিক জীবনে যে কী বিপর্যয় চলেছে সেটা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি। হেনা, আম্মা আর বাবুনকে তাই কাছে নিয়ে এসেছি। হোক না বাসাবোর এই খুপরির মতোন ঘর। এই শুকিয়ে যাওয়া ফুলের কুঁড়ি হেনাকে জীবনের সবুজ রসে সিঞ্চিত করে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। লীনা নেই। হেনাও যদি অমনি করে নিঃশেষ হয়ে যায় তবে আমি কী নিয়ে বাঁচবো?

যত কষ্ট হোক না কেন, স্বাধীনতার স্বাদ আমরা সবাই মিলে দু'হাতের মুঠো দিয়ে লুটেপুটে নেবো।

প্রতিদিনের নতুন শিশু সূর্যের আলো যেন আমার জন্য বয়ে নিয়ে আসে নতুন ইঙ্গিত। নতুন আশা। আমি আবার বুক ভরে নিশ্বাস নেই। আঘ্রাণ নেই সেই সুগন্ধ আর আলোর।

দেখি পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ। লক্ষ লক্ষ হীরের কুচি ছড়ানো রাতের পৃথিবী। আমি উন্মাদ হই, উন্মত্ত পিয়াসায়। বাংলার রূপসুধা পান করে আমি পরিপূর্ণ, জীবন্ত ও সজীব হয়ে উঠি। তবু এই অস্বাস্থ্যকর বাড়ির আবহাওয়া, আর্থিক অস্বচ্ছলতায় হেনার স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে থাকে। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে কোনো সমবেদনা নেই। আমি কপালে এক সূর্যের লেবেল সেঁটে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার পায়ের শৃঙ্খল খুলতে গিয়ে জলাঞ্জলি দিয়েছি আমার বাঁ-হাত খানি। আর লুণ্ঠিত হয়েছে হেনার ইজ্জত। তবু স্বাধীন দেশে এর মূল্যায়ন কোথায় হলো? আমি কী পেলাম? আমি আমার লীনাকেও যে হারিয়েছি।

যে আমাকে ভালোবেসে শুধু স্বপ্ন বুকে পুষে রেখেছিল, যার প্রকাশ হয়েছিল শুধু ছাব্বিশে মার্চের সকালে। তারপর থেকে আর কাছে টানতে পারিনি। বুক ভরে তাকে ডাকতে পারিনি। শুধু দূরে দূরেই রইল লীনা। কাছে আর এলো না।

আর খালেদ? আমার হাসি পায়, খালেদ আমার প্রিয় বন্ধু। জনপ্রিয় এককালের ছাত্রনেতা। মুঠো উত্তোলন করে কত শান্ত স্তিমিত প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কতদিনের কত শপথ। বাহান্নর সেই ভাষা আন্দোলন, পঁচিশে মার্চের পর সেই রক্ত শপথ, যার সঙ্গে হেনার বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এখন আর ভুলেও আমার চোখের সামনে পড়ে না। আমি জানি, হেনাকে সে কোনোদিনও আর গ্রহণ করবে না।

সে আর রাজনীতি করে না, এখন সে বিরাট শিল্পপতি।

সুসন্তান আর বুদ্ধিমান সন্তানদের বাংলা অনেক দিয়েছে, তারা শ্রদ্ধাবনত মাথায় লাঞ্ছিতাদের সম্মান জানায়। মুক্তিযোদ্ধাদের জানায় অশেষ শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা।

শুধু শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা? আর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ঊর্ধ্বমুখী চাল-ডাল আর কাঁচাবাজারের রাজত্বের বল্লমের খোঁচায় আমি দিনের পর দিন ক্ষতবিক্ষত হই।

সম্বল শুধুমাত্র কটা টিউশনি। আপিসের দোরে দোরে ধরনা দেই।
– আপনি মুক্তিযোদ্ধা?

– হ্যাঁ।

– কোন সেক্টরে কাজ করেছেন।

– যশোর সেক্টরে।

– দেখি আপনার সার্টিফিকেট।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করি, আমার মগজে টগবগ করে রক্ত ফুটছে। ফুটছে গ্লানির লাভা। যুদ্ধ করেছি দেশের জন্য। মায়ের জন্য। শত শত বোনের জন্য। এ যে চরম সত্য এ কি আমার প্রোজ্জ্বল চোখের তারায় লেখা নেই? আমার উন্নত প্রশস্ত ললাটে কি তার সাক্ষ্য নেই! যুদ্ধে খুইয়ে আসা বাঁ-হাতটিই কি তার জলন্ত প্রমাণ নয়? আমি তো চাকরির আশায় যুদ্ধ করিনি। প্রতিষ্ঠা অর্জন করার জন্য দিনের পর দিন এপার থেকে ওপার পর্যন্ত মৃত্যুপণ করে ছুটিনি। প্রতিষ্ঠা আর অর্থ উপার্জন করার ইচ্ছে থাকলে আমি হতে পারতাম বিশুদ্ধ দালাল। হতে পারতাম রাজাকার। হতে পারতাম আলবদর।

চাকরি প্রার্থী হয়ে যার কাছে এসেছি, সেও ঐ পর্যায়ের। আর আমি স্বাধীনতা বিপ্লবের সংগ্রামী তারই কাছে করুণাপ্রার্থী। নিজেকে ধিক্কার দেই। সার্টিফিকেটকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে

ঘৃণা হয় প্রচণ্ড। এখানে-ওখানে শিরদাঁড়া উঁচু করে আমি ঠোক্কর খেলাম। কিন্তু চাকরির সুরাহা হলো না। হাতে শুধু গোটা কয়েক টিউশনি। এ টিউশনির তরী বেয়েই আমি জীবন নদী পাড়ি দেব।

রুমী আপা একদিন এলেন। আমার নিজের কেউ নন। তবু আমাদের পরিবারের সঙ্গে তার হৃদ্যতা অনেক দিনের। অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল সাধারণ ঘরে-বরে। কিন্তু আজ আর সাধারণ মধ্যবিত্ত নন। তার চলনে-বলনে পরিস্ফুটিত হচ্ছে সুষমার দ্যুতি।

পরনের মিহি জাপানি সিফনের উপর জরি-চুমকির কাজ। সুখ আর প্রাচুর্যের মেদ সারা দেহে। ঐশ্বর্যের ঔজ্জ্বল্য সারা মুখাবয়বে। গলির ওপাশে আনকোরা নতুন 'ডাসান' দাঁড়িয়ে। জাদুকরের নিপুণ খেলায় ওদের জীবনযাত্রা সুন্দর-সুষম হয়ে উঠেছে।

হাসিমুখে রুমী আপা জিজ্ঞেস করেন– কেমন আছিস রাজু?

– ঐ বেঁচে আছি, কোনোমতে। একটি উজ্জ্বল জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

– এত হতাশ হয়ে গেছিস কেন? তোদেরই তো সবচেয়ে সুবিধে। এক একজন বীর যোদ্ধা। আচ্ছা খালাম্মা, রাজুর কি কোনোদিনও বুদ্ধি হবে না? তোর সার্টিফিকেটটাই তো এখন সবচেয়ে কাজের।

রুমী আপার কথায় মনে হয়, 'টেক্কার ট্রায়ো' আমারই হাতে। তার বদলে ইচ্ছে করলেই সব কিছু পেতে পারি।

মা আর হেনা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উন্মুখ হয়ে।

সত্যি, ভারি কষ্ট আমাদের। পাঁচশো টাকা যে আস্তানার জন্য দিই তাকে ঠিক বাড়ি বলা চলে না। পানিও অল্প। একটা কামরা আর একটা রান্নাঘর। আলো নেই, হাওয়া নেই, একবেলা শুধু ভাত খাই। দুবেলা রুটি।

মনে হয়, ঠিক যে সিঁড়িতে পা দিয়ে আছি, তার চৌদিকে সবাই শ্যাওলা ছড়িয়ে পিচ্ছিল করে রেখেছে। সবার ইচ্ছে আমি সরে দাঁড়াবো এই সিঁড়ি থেকে। প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে আছি সিঁড়িকে। আমি নড়ব না। ঝড় আসুক। আসুক বৃষ্টি। আমি স্থানুর মতো আমার নিজস্ব জায়গাটুকুতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকব।

রুমী আপারা এমনি করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ধাপে ধাপে স্কাইস্ক্রেপারের চূড়োয় উঠে যাবে। ওপরের আলো-হাওয়া কেমন তা কোনোদিনও আমি জানব না। আমি উপেক্ষিত ঘাস ফুলের মতো মাটির বুকে পড়ে থাকব। তবু কেন জেনেশুনে সবাই আমার মুখে বিষের পেয়ালা তুলে দিতে চাইছে? তুই একটা বুদ্ধু রে!

শাড়ির নরম আঁচল সামলে রুমী আপা আম্মার সঙ্গে রান্না ঘরে যায়। সত্যি কি সুখী ওরা!

আর আমি নিজে? শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে শহিদমিনারে পুষ্পার্ঘ্য ডালি দিতে যাই। ক্ষণিকের জন্য রক্ত দিয়ে লেখা পুরনো ইতিহাস মনে পড়ে যায়। মন সহসা কেমন করে ওঠে। সেই মুহূর্তে দেখি জনতার চোখে গভীর শ্রদ্ধার দ্যুতি।

আবার আমি হারিয়ে যাই। নিজের রক্তক্ষরণে নিজেই জ্বালা অনুভব করি। প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছি বিবেকের কাছে।

আমি হেরে যাচ্ছি। অথচ আশ্চর্য রুমী আপার মতো মানুষরা কী সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। মাথার শিরা দপদপ করে। ঝাঁ ঝাঁ করে মগজের কোষ।

হেনা চা আর গরম পিয়াজু নিয়ে আসে।

– ভাইয়া।

– কী রে? ওর দিকে তাকালেই আমার বুক মমতায় ছলকে ওঠে।

– কেন রে? তোদের খুব কষ্ট হচ্ছে?

– যা! হেনা লজ্জা পায়।

আমার মনে এই মুহূর্তে কতগুলো অগোছালো প্রশ্ন জাগে। যেমন যুদ্ধ কেন হলো? কে চেয়েছিল যুদ্ধ? কেন ভাত খেতে পাচ্ছি না আমরা? কেন আমি লীনাকে পেলাম না? কীভাবে রুমী আপার মতো মানুষরা স্বাধীন দেশে এত কালো টাকার মালিক হলো?

চা খেয়ে আমি চোরের মতো বেরিয়ে আসি রাস্তায়। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল নীল রঙের গাড়িখানা। ড্রাইভার গাড়ির গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

মূর্তিমান একটা পাপের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে গেলাম। ঐ নিষ্ঠুর নীল রং আমি আর সইতে পারছি না। ঐ নিষ্ঠুরতা থেকে, ঐ বিষাক্ত জগত থেকে হেনাকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি। গড়ে দিচ্ছি তার নিজস্ব একটি সংসার। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে হেনা তার স্বপ্নের ঘর রচনা করবে।

হেনা কাঁদছে। অবিরল ধারায় তার নকশা আঁকা মুখ ভিজে যাচ্ছে।

– বোকা মেয়ে, কাঁদে নাকি? নতুন আকাশের নিশানা তোকে দেখিয়ে দিলাম। এবার তুই পক্ষসঞ্চালনে নতুন নীলে স্নাত হয়ে উড়ে বেড়াবি নতুন আকাশে।

– হেনা, লক্ষ্মী বোনটি আমার। কাঁদে না।

হেনা চলে গেল স্বামীর ঘর করতে। বাড়ির কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে এলো। আম্মা, বাবুন খুব কাঁদছে। সবার চোখ ফোলা ফোলা। আমিও নিরালায় বোনটির জন্য কেঁদেছি। তবুও মনে ভারি তৃপ্তি, হেনা এবার তার বাঁচার পথ খুঁজে পাবে।

আমার সব ক্লান্তি, সব হতাশা ছাপিয়ে আবার বুকে সুগন্ধভরা মাথা তুলে দাঁড়ালো ধানের শিষগুলো, ফুটন্ত ফুলের কমনীয়তায় আবার বুক ভরে গেল।

তবু হঠাৎ করে সিলেটগামী 'উপবন'-এ ডাকাতির খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এই ট্রেনেই যে আমি ক্রন্দসী হেনাকে তুলে দিয়েছি।

পাগলের মতো ছুটোছুটি করলাম দুদিন। হেনার স্বামী কোনোরকমে বেঁচে গেছে। হেনা নিখোঁজ। তিনদিন পর হেনা ফিরে এলো, লাশ হয়ে।

হেনার লাল রঙের শাড়িতে অজস্র রক্তধারা শুকিয়ে চটচটে হয়ে গেছে। বোজা চোখের কাজল অশ্রুতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। হালকা গহনাগুলো গায়ে আর নেই। ওর কোমল-সরল মুখের মসৃণতায় অসংখ্য অত্যাচারের ছাপ। কৌলীন্যের মোড়া প্রবঞ্চনার রাজত্ব থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে হেনা, আমার ছোটো বোনটি।

আম্মা, বাবুন ডুকরে কেঁদে ওঠে, আমি কাঁদি না।

এই প্রথম অনুভব করি, আমার বুকের জীবন্ত সবুজ বাগানে কালবোশেখির মাতাল ঝড় বইছে। সেই সযত্নে লালিত স্বপ্নীল বাগানে– সতেজ সজীব ধানের শিষে শিলাপাত হচ্ছে অবিরত।

———○———

পুণ্যভূমির দেশে

ডালিয়া ইয়াসমিন

সিলেটগামী বাসটা এখনও আরামবাগে এসে পৌঁছায়নি। টিমের সবাই বাসের অপেক্ষায় আছে। আরামবাগে পৌঁছে দেখি সব পরিচিত মুখ। মেজবাহ, শাহানা, শম্পা, মিতা, শান্তা, জান্নাত, রোজী, সাবিনা, আঁখিসহ আরও অনেকে। ৩৭ জনের টিম। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের প্রথম টিম হিসেবে আমরা সিলেট যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস চলে আসলো। আমরা একে একে যার যার নির্ধারিত সিটে বসে পড়লাম। সিট প্ল্যান করে দিয়েছেন সিনিয়র ডিপিআইও কামরুজ্জামান স্যার। মোটামুটি ঢাকা ছাড়ার আগে স্যার বাসের সিট প্ল্যান থেকে শুরু করে হোটেলের রুম নম্বর, কবে-কখন-কোথায় যাব, কোথায় খাব সব পরিকল্পনা করে রেখেছেন। যাই হোক হইহই করতে করতে সিলেটের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়লাম রাত সাড়ে ১০টায়।

ওমা! ঢাকা ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বাসে সাবিনা চাঙাবাহার পান নিয়ে হাজির! সুরেলা কণ্ঠে গানে গানে সে পান বিক্রি শুরু করল এবং সফলভাবে পান বিক্রিও করল। গানে গানে ভিক্ষুক হয়ে আসলো মাজহার। এরপর মেজবাহ আসলো– জ্বালা জ্বালা করতে করতে। যত রকম জ্বালা সারানোর মলম তার কাছে আছে। আমি তো অবাক! চারদিকে এত প্রতিভার ছড়াছড়ি! ঢাকা-সিলেট হাইওয়েতে বাস থামল মর্জিনার বাড়ির সামনে। মর্জিনার বাড়ি থেকে আমাদের জন্য ম্যারা পিঠা, শুঁটকি ভর্তা আর গরম গরম জিলাপি দেওয়া হলো। মজার মজার খাবারগুলো বাসে আমাদের মধ্যে আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলো।

পরদিন সিলেটে পৌঁছালাম সকাল ৭টায়। উঠলাম পর্যটন মোটেলে। ফ্রেশ হয়ে নাশতা সারতে সারতে সকাল ৯টা। সাড়ে নয়টায় আমরা যার যার মাইক্রোবাসের সামনে চলে এলাম। ৪টা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে সার্বক্ষণিক সাথে থাকার জন্য। আগামী তিনদিন নির্ধারিত পর্যটন স্পটগুলোতে আমাদের নিয়ে যাবে সেভাবেই ঠিক করা হয়েছে। প্রথমদিন সকালে নিয়ে যাবে রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্টে। ৩৭ জনের টিম রওনা হলাম রাতারগুলের উদ্দেশ্যে। রাতারগুল যখন পৌঁছালাম তখন পৌনে বারোটার কাছাকাছি। সাতটা নৌকা ভাড়া করা হলো। নৌকাগুলো ধীরে ধীরে বেয়ে চলল ঘন জঙ্গলে আবৃত রাতারগুলের মধ্যে। নীচে পানি আর ঘন গাছগুলো মাথার উপরে ছেয়ে আছে ছাতার মতো। দু-একজন মাঝি গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল। তাদের গান আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি হয়ে দারুণ এক আবহ তৈরি করল। এর মধ্যে শুনলাম আমাদের এক নৌকায় নাকি সাপ উঠেছিল। রাতারগুলের এসব গাছে নাকি সাপ থাকে। শুনে তো হিম হয়ে গেলাম! যাই হোক সবুজ গাছে আবৃত পানির মধ্যে বেয়ে চলা আমাদের নৌকাগুলো দুপুর ২টায় ঘাটে ফিরে এলো।

মাইক্রোবাস এবার রওনা হলো দ্বিতীয় স্পট বিছানাকান্দির উদ্দেশ্যে। দুপুরের খাবার আমরা সেখানেই করব। তবে বিছানাকান্দির রাস্তা বেশ খারাপ। ভাঙা, এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা যেন শেষই হয় না। প্রায় সাড়ে তিনটায় পিয়াইন নদীর ঘাটে পৌঁছালাম। যথারীতি নৌকা ভাড়া করা হলো বিছানাকান্দি যাবার জন্য। নদীর চারপাশের ঘরবাড়ি, মা-বোনদের কলসি কাঁখে পানি নেওয়া, জেলে ভাইদের মাছ ধরা দেখতে দেখতে চলে এলাম বিছানাকান্দি। তখন বিকাল সাড়ে চারটা। ক্ষুধায় সবার অবস্থা বেশ খারাপ। হাঁসের মাংস দিয়ে গরম ভাত তখন অমৃত মনে

হচ্ছিল। গোগ্রাসে খাওয়া শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। এবার নেমে পড়লাম বিছানাকান্দির স্বচ্ছ পানিতে। বড়ো বড়ো পাথর, চারদিক কাঁচের মতো স্বচ্ছ পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দারুণ লাগছিল। বিকেলের কনে দেখা আলোয় বিছানাকান্দির সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ। এবার ফেরার পালা। নৌকায় আবার পিয়াইন ঘাট। চা-চক্র শেষে ফিরলাম মোটেলে। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষে আমরা সবাই কনফারেন্স রুমে জড়ো হলাম রাত ১০টায়। সবাই তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত। ঘুমঘুম চোখে ২টা সেশন চলল। রুমে যখন ফিরি তখন রাত ১২টা।

সকাল সকাল উঠে পড়লাম। ফ্রেশ হয়ে নাশতা সেরে আমরা গতকালের মতো আজও ৯টায় নির্ধারিত মাইক্রোবাসের সামনে সবাই উপস্থিত হলাম। আজ নতুন স্পটে যাব। রওনা হলাম জাফলং জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। খুব অল্প রাস্তা। ঘণ্টাখানেকের মতো লাগল। স্পটে পৌঁছে আমরা খানিকক্ষণ ইতস্তত ঘুরতে লাগলাম। পাহাড়ে কেউ কেউ ছবি তুলতে, কেউ কেউ পাটা-পুতো, চকলেট, সাবান বাহারি ভারতীয় পণ্য কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাইকে একত্রিত করে পাহাড় থেকে নীচে নামতে শুরু করলাম। নীচে নেমে নৌকা ভাড়া করা হলো। ডাউকি নদীতে নৌকা গিয়ে থামলো জাফলং জিরো পয়েন্টে। উভয়দিকে উঁচু দুই পাহাড়কে সংযোগ করেছে একটি ব্রিজ! দশ বছর আগে যেমন দেখেছিলাম এই সৌন্দর্য। আজও তেমনি অবিকৃত আছে। ডাউকি নদীর একটা অংশ বাংলাদেশের আর একটা অংশ ভারতের মধ্যে পড়েছে। এই অপরূপ সুন্দরকে যদি ক্যামেরায় ধারণ করে না রাখি তবে খুব অন্যায় হবে! তাই প্রতি ছবি ২ টাকা শর্তে ক্যামেরাম্যানকে ভাড়া করলাম। সেদিনকার মতো নিজের ফোনের ক্যামেরাকে ছুটি দিলাম।

ডাউকি নদীতে আবার নৌকায় উঠলাম। এবার গন্তব্য খাসিয়া পল্লি। খুব ছিমছাম গোছালো। খাসিয়া পল্লির প্রতিটি বাড়ি উঁচু করে বানানো। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এগিয়ে চলছি। বড়ো বড়ো সুপারি গাছ বেয়ে পান গাছ উপরে উঠে গেছে। খাসিয়া জনগোষ্ঠীর পাকা দোতলা বাড়ি দেখে মনে হলো তারা বেশ সচ্ছল। অটো গিয়ে থামল খাসিয়া পল্লির চা বাগানে। হরেকরকম চায়ের পসরা সাজানো। প্রায় ৭/৮ রকম চা যেমন কাঁচা পাতার চা, মাল্টা চা, লেমন চা, রং চা। দু-এক পদের চা টেস্ট করেই কিনে ফেললাম মাল্টা চা। এবার ফেরার পালা। যাবার কথা ছিল মায়াবী ঝরনায়। কিন্তু রাস্তা পানিতে ডুবে যাওয়ায় আর এ স্পটে যাওয়া হলো

না। ফিরলাম জাফলংয়ে। ঘড়িতে বিকাল সাড়ে তিনটা। দুপুরের খাবারের জন্য ঢুকলাম স্থানীয় এক হোটেলে। খাবার খুব মানসম্মত বলে মনে হলো না। তারপরও ক্ষুধা বলে কথা! রওনা হলাম লালাখালের উদ্দেশ্যে। নৌকা ভাড়া করা হলো। দিনের আলো তখন নিবু নিবু করছে। সন্ধ্যার নীলিমায় লালাখালের মৃদু-মন্দ ঠান্ডা বাতাসে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ধুপ করে সন্ধ্যা নেমে এলো। ফিরে এলাম ঘাটে। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল মোটেলে ফিরতে। রাতের খাওয়া শেষ করে সবাই আমরা কনফারেন্স রুমে বসলাম। তখন রাজ্যের ক্লান্তি শরীরে ভর করেছে। কিন্তু কামরুজ্জামান স্যারের আমন্ত্রণে যখন একে একে সবার গিফট লটারির মাধ্যমে খোলা হচ্ছিল, তখন একটা টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দারুণ উপভোগ্য ছিল গুনে গুনে সাইত্রিশটা গিফট দেখা।

সিলেটের একটা আশ্চর্য বিষয় হলো কোনো স্পটই নৌকা ছাড়া যাওয়া যায় না। আজ তৃতীয় দিনের শেষ স্পট হলো ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর। ভারতের বড়ো বড়ো মেঘালয় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আমরা নৌকায় করে পৌঁছালাম ভোলাগঞ্জ, সাদাপাথর। যেখানে নৌকা থেকে নামলাম সেখান থেকে বালুপথ পেরিয়ে এক স্রোতস্বিনী জলধরায় এসে পৌঁছালাম। যার চারদিকে সবুজ পাহাড়। নীল পানির স্বচ্ছ জলধারায় নেমে পড়ল পুরো টিম। সবাই মোটামুটি গোসল করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। পানিতে নেমেই বুঝলাম বেশ স্রোত। এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। স্রষ্টার কী অপরূপ সৃষ্টি! সবাই বাচ্চাদের মতো আনন্দ করল। স্বচ্ছ, ঠান্ডা, পরিষ্কার পানিতে সবাই খুব ঝাঁপাঝাঁপি করল।

সাদাপাথর থেকে ফিরলাম দুপুরে। আজ মোটেলে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা। খেয়ে দেয়ে বিছানায় গা এলানোর সাহস পেলাম না। কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের বের হতে হবে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ ও পুণ্যভূমির দেশ সিলেটের শাহজালাল মাজারের উদ্দেশ্য। সেখানে মাগরিবের নামাজ পড়া হবে। তার আগে আশরাফ টি-স্টোরে আমরা সবাই চা কিনলাম। শাহজালাল মাজারে সন্ধ্যায় সহকর্মীরা নামাজ আদায় শেষে আমাদের লামাবাজারে ছেড়ে দেওয়া হলো কেনাকাটার উদ্দেশ্য। মনিপুরি শাড়ি, হাতে বোনা তাঁতের সালোয়ার-কামিজ আরও কত কী

কিনতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। মোটেলে ফিরলাম রাত ৮টায়। রাতের খাওয়া শেষে যার যার লাগেজ গুছিয়ে নামানো হলো লবিতে। রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হব।

কত সুন্দর সিলেটের প্রতিটি পর্যটন স্পট! কেন জানি দেখে মনে হলো যত্নের অনেক অভাব রয়েছে। প্রকৃতি যতটুকু দয়া করে মেলে ধরে আছে শুধু অতটুকু! সবখানে সিন্ডিকেট! নৌকার ভাড়া থেকে শুরু করে কয়জন যাত্রী উঠবে সব সিন্ডিকেটের দখলে। খাবারের মান তো খুবই খারাপ। যে কয়েকটা ভালো খাবারের দোকান আছে তাতে খাবারের দাম চড়া। সবগুলো স্পট পলিথিন, চিপসের প্যাকেট দিয়ে নোংরা করে রাখা হয়েছে। মেঘালয়ের এত কাছে পাহাড়বেষ্টিত সিলেটকে আমরা পর্যটনের বিশাল এক হাবে পরিণত করতে পারতাম। এখনও সম্ভব। শুধু দরকার একটু সদিচ্ছা। দরকার পর্যটনবান্ধব কার্যকর পরিকল্পনা।

রাত সাড়ে এগারোটায় বাস সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। আমরা সবাই বাসে চড়ে বসলাম। কর্মব্যস্ত জীবনে আবার ফিরে আসা। তবে পেছনে রেখে আসলাম জীবনের কিছু রঙিন স্মৃতি, যা কোনোদিন মলিন হবে না।

ডালিয়া ইয়াসমিন: সিনিয়র সম্পাদক (সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ) ডিএফপি, dalia.easmin@gmail.com

চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড পেল আসামবস্তি-কাপ্তাই সংযোগ সড়ক

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার অপূর্ব সমন্বয়ে পরিণত হয়েছে রাঙ্গামাটির আসামবস্তি-কাপ্তাই সংযোগ সড়ক। পুরো সড়কের একদিকে বিস্তীর্ণ কাপ্তাই হ্রদ, আরেকদিকে সবুজ ঘেরা পাহাড়। সবুজ পাহাড় আর নীল জলরাশির হ্রদের 'বুক চিরে' জেগে ওঠা ১৮ কিলোমিটার সড়কটি দুই লেনে উন্নীত করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি)। নান্দনিক এই সড়কটি সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে প্রকল্প হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

প্রকল্পটির ম্যানেজার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার অর্জন করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) রাঙ্গামাটি কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী আহামদ শফি। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজধানী ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মো. আলি আখতার হোসেনের কাছে পুরস্কারটি তুলে দেন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (পিএমআই) বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট অন্বেষা আহমেদ।

১৮ কিলোমিটার নান্দনিক সড়কটি সম্প্রসারণ করেছে এলজিইডি রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা দফতর। এ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রকৌশলী প্রণব রায় চৌধুরী বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা করেছি। পুরো ১৮ কিলোমিটার সড়কটি এক লেনের সড়ক থেকে দুই লেনে উন্নীত করা হয়েছে, রয়েছে তিনটি নান্দনিক আরসিসি গার্ডার সেতুও। ৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পটি সম্পন্ন শেষে এলজিইডির তিন কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে দাবি করেন এই প্রকৌশলী।

প্রজেক্ট ম্যানেজার ও এলজিইডি রাঙ্গামাটির নির্বাহী প্রকৌশলী আহমদ শফি বলেন, রাঙ্গামাটির মতো দুর্গম এলাকার একটি প্রকল্প আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

রাঙ্গামাটিতে পর্যটক ও স্থানীয়দের ভ্রমণে পছন্দের শীর্ষে থাকে আসামবস্তি-কাপ্তাই সংযোগ সড়কটি। সংস্কারের পর সড়কটির সৌন্দর্য আরও বেড়েছে। গত কয়েক বছরে রাঙ্গামাটি সদরে যে কটেজ-রিসোর্টগুলো গড়ে উঠেছে, তার ৮০ শতাংশই এই সড়কটি ঘিরে।

প্রতিবেদন: প্রশান্ত দে

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের উদ্যোগ ও জনগণের করণীয়

দীপংকর বর

জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সকল ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী ও আনুবীক্ষণিক জীব টিকে থাকার জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। জীবের বৈচিত্র্য যত বেশি থাকবে, জীবের সুবিধাও তত বেশি হবে। অসংখ্য পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবন টিকিয়ে রাখতে জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকেই মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান তৈরির সামগ্রী, জ্বালানি প্রভৃতি পেয়ে থাকে। অনুজীব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পঁচিয়ে বিশ্লিষ্ট করে, ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির জীব প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর করে তোলে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন কিংবা যান্ত্রিকীকরণ, নগরায়ণ, নির্বিচারে বন ধ্বংস, দূষণ, মাটির অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ পৃথিবীতে মানুষের মতো অন্যান্য সকল প্রাণীরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। নিজেদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থেই সকল জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ শুরু করেন। তিনি এ লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৩' জারি করেন এবং ১৯৭৪ সালে আইন আকারে কার্যকর করেন। দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রদান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকার ২০০৯ সাল থেকে বিগত ১৫ বছরে পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও দেশের পরিবেশের মানোন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিকন্তু বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহকে অধিকতর যুগোপযোগী করে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা অন্যতম। প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ সুরক্ষা উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো– প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলার মাধ্যমে দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করছে। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মোট ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণাপূর্বক সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও দেশে জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সনদের অন্তর্গত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নে কাজ করেছে। সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'অ্যাসেসমেন্ট অব কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন বায়োডাইভার্সিটি রিসোর্সেস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য ব্লু ইকোনমি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ অন্যান্য সংকট মোকাবিলা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বননির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।

বনায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বন ও বন্যপ্রাণী সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ২টি অ্যাকশন প্ল্যান, ২টি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ও বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও ১টি আইন, ৮টি বিধিমালা ও ৫টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৪টি ইকোপার্ক,

১টি উদ্ভিদ উদ্যান, সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড ও সেন্টমার্টিনে ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৭টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫৩টি। সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকা, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং সেন্টমার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কারিগরি প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 'ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া'-এর খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ চলমান আছে। রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী করা হচ্ছে। এছাড়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও কোরিডোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২০২৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'গ্লোবাল টাইগার রিকভারি প্রোগ্রাম' বাংলাদেশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য 'ন্যাশনাল টাইগার রিকভারি প্রোগ্রাম'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বাঘ সংরক্ষণ ও সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমসমূহ এ দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুন্দরবনে ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ফলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবনে পুনরায় বাঘের সংখ্যা গণনার জন্য ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে তৃতীয়বারের মতো বাঘ জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সুন্দরবনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৫ হাজার কিমি. 'স্মার্ট প্যাট্রোলিং' কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ এলিফ্যান্ট কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২০২৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবাউন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে। হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ৬টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্যসহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যানসহ ডলফিন সংক্রান্ত মোট ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' বাংলা শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ভালচার কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৬-২০২৫' সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক' এবং 'কিটোপ্রোফেনে'র উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রেমা-কালেঙ্গাস্থ ভালচার ফিডিং স্টেশন মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। শকুন রেসকিউ সেন্টার কার্যক্রমের অধীনে হিমালয়ান গ্রিফনের উদ্ধার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং শকুন উদ্ধার কেন্দ্র থেকে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। বাংলা শকুন শুমারি সম্পন্ন হয়েছে।

সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমিরের কনজারভেশন ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রের লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালনপালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সামুদ্রিক বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ২টি হাঙ্গর প্রজাতি ও ২টি শাপলাপাতা মাছ প্রজাতির নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং এবং বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২০৩৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং জরিপ পরিচালিত হয়েছে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

হিংস্র বন্যপ্রাণী কর্তৃক কেউ নিহত বা আহত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লক্ষ্যে 'বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা ২০২১' জারি করা হয়েছে। বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রণীত এ বিধিমালা অনুযায়ী ২০১০ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পঙ্গু/ঘরবাড়ি/ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১ হাজার ৬ শত ৬৯ জনকে প্রায় ৬ কোটি ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণীদের অবৈধভাবে হত্যা নিবারণে এ সংক্রান্ত অপরাধ দমন করতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার ও বিক্রয়কালে জুলাই ২০১২ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত উভচর, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পাখিসহ মোট ৪১ হাজার ৮ শত ৮৯টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ১ হাজার ৪ শত ৫টি ট্রফি উদ্ধার এবং ১ শত ২৯টি মামলা দায়েরসহ ১ শত ৯৫ জন অপরাধীকে জরিমানা ও কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় বাঁশের কঞ্চিকলম, টিস্যু কালচার, গোলপাতা নার্সারি, নার্সারিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ১০টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে। ৮টি বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ যেমন: বৈলাম, চন্দন, রক্তন, হলদু, সাদা গর্জন, সিধা জারুল, পাদক, ও রিঠা প্রভৃতির টিস্যু কালচার প্রটোকল প্রণয়নের কাজ চলছে। শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্রে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, স্মার্ট পেট্রলিং ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৫টি রক্ষিত এলাকায় বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১ হাজারটি উদ্ভিদের মূল্যায়নপূর্বক রেড লিস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ১ হাজারটি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ৭টি প্রাথমিকভাবে বিলুপ্ত, ১টি বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত, ৫টি মহাবিপন্ন, ১ শত ২৭টি বিপন্ন, ২ শত ৬২টি সংকটাপন্ন, ৬৯টি প্রায় বিপদগ্রস্ত, ২ শত ৭১টি ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া আরও ২ শত ৫৮টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে তথ্য ঘাটতি হিসেবে নিরূপণ করা হয়েছে। পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ১৭টি আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ উদ্ভিদগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য পাঁচটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্ভিদের জাতীয় লাল তালিকার ২টি ভলিউমের কাজ চলমান রয়েছে।

বৈশ্বিকভাবে সংকটাপন্ন ১০ প্রজাতির শিকারি পাখিসহ মোট ৫২ প্রজাতির শিকারি পাখির বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য ১০টি সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। এদের বিস্তার ও অবস্থা নিয়ে ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে দেশি গুটি ঈগল এবং মেটে-মাথা মাছ ঈগলের প্রজননকালীন সময়ের খাবারের যথাযথ একটি তালিকা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জনগণের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিকারি পাখির হুমকিসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে এবং তাদের বিশ্রাম ও বাসা তৈরিতে ব্যবহৃত গাছগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা করা হয়েছে। শিকারি পাখি সংরক্ষণে দেশব্যাপী আটটি শিকারি পাখি সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিকারি পাখি সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিকারি পাখি সংরক্ষণে *শিকারী পাখি সংরক্ষণ নির্দেশিকা* নামক একটি বাংলা সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে ও শিকারি পাখি সংরক্ষণ দলের সদস্যদের বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিকারি পাখির বই *রেপটর্স অব বাংলাদেশ* সংকলন করে ডিজাইনের কাজ চলছে। ৩টি হিমালয়ী শকুনের পরিযায়ন পথ সম্পর্কে জানতে স্যাটেলাইট ট্যাগ লাগানো হয়েছে। ট্যাগকৃত পাখিগুলো সফলভাবে পরিযায়ন করেছে। তাদের মনিটরিং অব্যাহত আছে। শিকারি পাখি সংরক্ষণে একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান 'কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর রেপটর্স ইন বাংলাদেশ' তৈরি করা হয়েছে। পরিযায়ী পাখির ৬টি ফ্লাইওয়ে সাইটে রেগুলার সার্ভে করা হয়েছে।

পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে মোট ৬টি সাইট ম্যানেজমেন্ট কমিটি করা হয়েছে এবং কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে সাইট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের কার্যদক্ষতা বাড়ানোর জন্য *বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি ও পরিযায়ন এলাকা সংরক্ষণ নির্দেশিকা* নামক একটি বাংলা সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে। ৭টি পরিযায়ী হাঁস এবং আরও ৫টি সৈকত পাখিতে তাদের পরিযায়ন পথ সম্পর্কে জানতে স্যাটেলাইট ট্যাগ লাগানো হয়েছে। ট্যাগকৃত পাখিগুলো সফলভাবে পরিযায়ন করেছে এবং তাদের মনিটরিং অব্যাহত আছে। ফ্লাইওয়ে সাইটস ম্যানেজমেন্টের জন্য 'স্ট্র্যাটেজিক কনজারভেশন প্ল্যান ফর ফ্লাইওয়ে সাইটস অব বাংলাদেশ' নামক একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ৩২টি সাইটে মোট ৪৬টি পাখির শুমারি করা হয়েছে। ৬টি বার্ড রিংগিং ক্যাম্প করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৪ শত ১৪টি পাখিতে রিং পরিয়ে নিরাপদে অবমুক্ত করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের মোট ১০ জন কর্মকর্তাকে পাখি গণনা ও রিংগিং টেকনিকের ওপর দক্ষতা বাড়াতে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়েও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জলাভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ ওয়েটল্যান্ড উইথ এ ফোকাস অন ওয়াটার বার্ডস' নামক একটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে ।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারের পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই এ বিষয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য আন্তর্জাতিক বন দিবস, আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস, বিশ্ব হাতি দিবস, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস, বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস, আন্তর্জাতিক শকুন দিবসসহ এ সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপী নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে জনগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিবছর 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার' এবং প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সংস্থাকে 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' প্রদান করা হচ্ছে। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সোস্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

সকলের প্রিয় এ পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে আমাদের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতেই হবে। আর জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে জীবগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক বাসভূমি বা স্বাভাবিক বাসস্থান বিনষ্ট করা ও অতিরিক্ত শিকার বন্ধ করতে হবে। জীবের আবাসস্থল ধ্বংস করে সকল ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, নির্বিচারে বন নিধন ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন বন্ধ করতে হবে। সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ রোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সকল জীবের প্রতি মানুষের অঙ্গীকার পূরণে সকলে মিলে কাজ করলে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সফলতা আসবেই।

দীপংকর বর: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, dpnkrbar@gmail.com

বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ পেল পাঁচ নারী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজ, নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য পাঁচ নারীকে বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ প্রদান করেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ১৪৩তম জন্ম ও ৯১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৯ই ডিসেম্বর নগরীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ পদক বিতরণ করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন এবং বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ বিতরণের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ প্রাপ্তরা হলেন: খালেদা একরাম (মরণোত্তর), ডা. হালিদা হানুম আক্তার, কামরুন্নেসা আশরাফ দিনা (মরণোত্তর), রণিতা বালা এবং নিশাত মজুমদার। পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণপদক, একটি সার্টিফিকেট ও ৪ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি এবং সচিব নাজমা মোবারেক। পুরস্কার বিজয়ীদের পক্ষে নিশাত মজুমদার পুরস্কার জয়ে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন : পি আর শ্রেয়সী

মুক্তিযুদ্ধের অমর গাথায় শিল্পী সাধন ও ডা. ফজলে রাব্বী

শ্যামল দত্ত

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো ॥...

তাঁর সুরেলা কণ্ঠ থেকে এভাবেই ঝরে পড়তো রবীন্দ্রসংগীতের হৃদয় আকুল করা বাণী। হ্যাঁ, এমনই কথা ছিল। কিন্তু তাঁর সুরেলা কণ্ঠে সেদিন গানের কোনো সুরধ্বনি শোনা যায়নি। বরং হৃদয় মথিত করা বড়ো অদ্ভুত এক সুর ব্যঞ্জনায় আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছিল। আর তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল স্লোগান, 'জয় বাংলা'। এই ছোট্ট একটি স্লোগানের কী অসীম ক্ষমতা। যেন মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে সব কিছু। মানচিত্র, ভূখণ্ড, জাতীয় পতাকা সব বদলে দিতে পারে ঐ একটি স্লোগান।

বলছিলাম উনিশশো একাত্তরের সেই আগুনঝরা দিনগুলোর কথা। পাবনা জেলার সবার কাছেই অতি পরিচিত তিনি গোলাম সরোয়ার খান সাধন। বাবা আবদুল হামিদ খান, মা বেগম সুফিয়া খানম। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট হাই স্কুলে। পরে পাবনার রাধানগর মজুমদার একাডেমি (আর এম একাডেমি) থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৫ সালে সাধন যখন স্কুলের ছাত্র, তখন পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশুনার পাশাপাশি সামরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে পাবনার পুলিশ লাইন মাঠে শিক্ষার্থীদের রাইফেল চালনার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগ দেন সাধন। এরপর সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাবনা জেলা স্কুলের শিক্ষক মওলানা কসিমুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাদানেরও প্রশিক্ষণ নেন। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সেই চরম উত্তেজনাময় দিনগুলোতে শহরজুড়ে যখন সান্ধ্য আইন জারি হয়, সাধনের মতো কিছু উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবী তরুণ তখন শহর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পান। সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিন্তু সাধন কখনও পড়াশুনাকে অবহেলা করেননি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সাধন ভর্তি হন পাবনার সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে। এখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

গোলাম সরোয়ার খান সাধন

ডা. ফজলে রাব্বী

এরপর ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্নাতকোত্তর শ্রেণির উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের মেধাবী ছাত্র ছিলেন সাধন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও হয়ে উঠেছিলেন পরিচিত মুখ। কোনো সভা-সমাবেশ কিংবা ছাত্র-মিছিলে সাধনকে কেউ কখনও বক্তৃতা কিংবা স্লোগান দিতে দেখেনি। তাঁর কণ্ঠে সবাই গান শুনেছে। দেশের বন্যা বা ঘূর্ণিদুর্গত মানুষদের সাহায্যেও গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে রাস্তায় নেমেছেন সাধন। উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছেন–

ভিক্ষা দাও হে নগরবাসী, ভিক্ষা দাও হে মহৎপ্রাণ,
বন্যা কবলে ডুবে গেলো যারা, অসহায়গণে কর হে দান।...

গানের প্রতি ভালোবাসা ছিল সাধনের ছেলেবেলা থেকেই। আর তাই পাবনার অন্যতম সংগীতচর্চা কেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস (ইফা)-তে ভর্তি হয়েছিলেন। রবীন্দ্র, নজরুল, আধুনিক, দেশাত্মবোধক প্রায় সব ধরনের গানের প্রতিই ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। গানের পাশাপাশি আরও একটি শখ ছিল সাধনের, পাখি শিকার। এজন্য একটি বন্দুক কেনার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সে শখ আর পূরণ হয়নি। দেশের রাজনৈতিক ঝড়োহাওয়া তখন মানুষের ঘরের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে। ১৯৬৬-র ঐতিহাসিক ছয় দফা কিংবা ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে গণসংগীত শিল্পী হিসেবে সাধনকে দেখা গেছে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও গণমিছিলে। এরপর এলো ১৯৭১-এর সেই আগুনঝরা ৭ই মার্চ। ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের এক বিশাল জনসমাবেশে বাঙালির অধিকার আদায়ের পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বললেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি সবাইকে 'ঘরে ঘরে দুর্গ' গড়ে তোলারও আহ্বান জানালেন। সেই উত্তাল জনসভার ঢেউয়ে সারা দেশ তখন উদ্বেলিত। সেদিনের মফস্বল শহর পাবনাতেও ৭ই মার্চের উত্তাল জনসভার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল। কণ্ঠশিল্পী সাধন সিদ্ধান্ত নিলেন এবার আর ঘরে বসে গান গাইলে চলবে না। এখন গান নয়, গান ছেড়ে যুদ্ধের অস্ত্র তুলে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদেশে প্রাথমিকভাবে সাধন নিজের বাড়িকেই দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজের হাতেই তৈরি করলেন কিছু দেশি অস্ত্র তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদি। সবই ঘরোয়া অস্ত্র। কিন্তু দিন যতই যায়, দ্রুত সব কিছু পাল্টাতে থাকে। এরপর সময় গড়িয়ে এলো ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ কালরাত। পাকিস্তানের বর্বর সেনাসদস্যরা ঢাকায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। পাবনার সাধারণ মানুষ তখন কিছুই জানে না।

পরদিন ২৬শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ ভোররাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাবনা পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পাবনার অকুতোভয় পুলিশ বাহিনী জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। পাবনা পুলিশ লাইনের যুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগ দেয় পাবনার ছাত্র-জনতা। তারাও একসাথে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধের অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন রফিকুল ইসলাম বকুল। যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি শিকার করে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি-হানাদার বাহিনী পুলিশ লাইন থেকে পিছু হটে তাড়াশ ভবন সংলগ্ন তৎকালীন

টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এসে অবস্থান নেয়। পাবনার ছাত্র-জনতা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা একসাথে পাবনার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য প্রাণ হারায়।

এরপর ২৯শে মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা সত্যিকার অর্থেই শত্রুমুক্ত হয়। এসময় শহরের কালাচাঁদ পাড়া এলাকা থেকে সাহসী তরুণদের সংগঠিত করে সাধন তাঁদেরকে প্রতিরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। স্কুল জীবনে স্কাউটিং আর কলেজ জীবনে সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ এবার সত্যিকারের কাজে লাগে। সহযোগীদের নিয়ে সাধন শহরের প্রবেশমুখ নগরবাড়ি ঘাটে বাংকার তৈরিতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানেই গড়ে ওঠে স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ক্যাম্প। কেননা নৌপথে ঢাকা থেকে ভারী অস্ত্রসহ সেনাদের পাবনায় আসার জন্য তখন এটাই ছিল একমাত্র পথ। এদিকে, পাবনায় চরম বিপর্যয়ের পর দিশেহারা শত্রু সেনারা পাবনা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাতে শুরু করে। শহরের ওপর দিয়ে শত্রুদের জঙ্গিবিমানের ঘন ঘন মহড়ায় শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা জীবন বাঁচাতে পরিবার-পরিজনসহ শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পালাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে নৌপথে নগরবাড়ি ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের মেশিনগান, মর্টার, কামানের পাশে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ রাইফেল আর সামান্য গোলা-বারুদ ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। নগরবাড়ি ঘাটের প্রতিরোধ বাংকার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। ১০ই এপ্রিল বিকেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাবনা শহর পুনর্দখল করে। সেই চরম মুহূর্তে সাধন তাঁর সহযোগীদের সাথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। বাবা-মাকে গ্রামের এক বাড়িতে রেখে সাধন তাঁর ছোটো ভাই শাহনেওয়াজ খান স্বপনকে নিয়ে ভারতে পাড়ি জমান। যাবার সময় মাকে বলে যান, যুদ্ধ শেষে যদি ফিরতে পারি তবে দেখা হবে, নইলে আজই শেষ বিদায়। যদি আর কখনও না ফিরি, আমার হারমোনিয়ামটা যত্ন করে রেখে দিও।

ভারতে পৌঁছানোর পরপরই সেখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কণ্ঠশিল্পী সাধনের ডাক আসে। কিন্তু সাধন হারমোনিয়াম কবেই ছেড়েছেন, হাতে তুলে নিয়েছেন যুদ্ধের অস্ত্র। তাই বেতারে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলেন। বললেন, দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। এখন কে শিল্পী, কে কবি দেখার সময় নেই। যুদ্ধ করে আগে দেশটা স্বাধীন করি, তারপর নিজেকে শিল্পী প্রমাণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

মুক্তিযুদ্ধে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সাধন ভারতের দেরাদুনে চলে যান। দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১১ সদস্যের এক মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে সাধন দেশে আসেন। প্রথমদিকে পাবনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় তারা গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদরদের সাথে যুদ্ধ করেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা পাবনার সুজানগর থানার সাগরকান্দি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আসে ৬ই সেপ্টেম্বর। সারারাত যুদ্ধ করে ভোরের দিকে তাঁরা গ্রামের একটি ভাঙাচোরা জীর্ণ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সবাই তখন দারুণ পরিশ্রান্ত। হয়ত ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। স্থানীয় একজন রাজাকার তাঁদের গোপন অবস্থানের বিষয়টি জানতে পারে। সে আর দেরি না করে দ্রুত পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে খবর দেয়। খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। সাধন এবং তাঁর দলের সদস্যরা শত্রুদের অবস্থানের বিষয় জানতে পেরে নিজেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে। তাঁদের পাবনার নগরবাড়িতে পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় তাঁদের ওপর নির্মম পৈশাচিকতা। চারদিন ধরে নির্যাতন চালানোর পর বেয়নেট দিয়ে সাধনের চোখ উপড়ে ফেলা হয়। তারপর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে দেওয়া হয় স্রোতস্বিনী যমুনার জলে। সেই লাশের সন্ধান পরে আর কেউ কখনও পায়নি।...

ডাক্তার ফজলে রাব্বীর কথা কি আমরা ভুলে গেছি? মানব সেবাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আর্তমানবতার ডাকে কখনও দু-বার ভাবেননি। যে-কোনো পরিস্থিতিতে ছুটে গেছেন অসুস্থ মানুষের পাশে। বাড়িয়ে দিয়েছেন সেবার হাত। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে হাতে তিনি মানুষের সেবা করেছেন, ইতিহাসের ঘৃণিত পশুরা তাঁর সেই হাত দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। তাঁর যে চোখ গভীর মমতায় মানুষের অসুস্থতার কারণ পর্যবেক্ষণ করেছে, পশুরা সেই চোখ দুটো বেয়নেটে উপড়ে ফেলেছে। কী অপরাধ ছিল তাঁর, কেন তাঁকে নির্মম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবন দিতে হলো, কেন?

ফজলে রাব্বী ছিলেন এ দেশের একজন অসাধারণ কৃতী চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী। পাবনা জেলার হেমায়েতপুর থানার ছাতিয়ানী গ্রামে ১৯৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। বাবা আফসার উদ্দিন আহমেদ এবং মা সুফিয়া খাতুন। ফজলে রাব্বীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল পাবনা জেলা স্কুলে। এই স্কুল থেকেই ১৯৪৮ সালে মেধা তালিকায় বিশেষ স্থান অর্জন করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর চলে আসেন ঢাকায়। ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণের পর ১৯৫০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস প্রথম পার্ট পরীক্ষায় অ্যানাটমি ও ফার্মাকোলজিতে সম্মানসহ এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকে ভূষিত হন ফজলে রাব্বী। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ডা. রাব্বী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নি চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ফজলে রাব্বী যুক্তরাজ্যে যান। ১৯৬০ সালে যুক্তরাজ্যের এডিনবরা থেকে লাভ করেন এমআরসিপি ডিগ্রি। ১৯৬৩ সালে দেশে ফিরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কার্ডিওলজিস্ট নিযুক্ত হন। অর্থাৎ একইসঙ্গে তিনি মেডিসিন ও হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। অধ্যাপনা ও চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি ডা. রাব্বী গবেষণার কাজও করতেন। তাঁকে একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী বললেও ভুল বলা হয় না। *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল* ও *ল্যান্সেট* সাময়িকীতে তাঁর প্রচুর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯৭০ সালে তাঁর বিশ্বখ্যাত গবেষণা Spirometry in tropical pulmonary eosinophilia প্রকাশিত হয়েছিল *ব্রিটিশ জার্নাল অব দ্য ডিজিজ অব চেস্ট* ও *ল্যান্সেট*-এ। ১৯৭০ সালে মাত্র ৩৮ বছর

বয়সেই ডা. ফজলে রাব্বী পাকিস্তানের সেরা অধ্যাপক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে সেই পুরস্কার প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন ফজলে রাব্বী। ঢাকা মেডিকেল কলেজে সব ধরনের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডেও তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র ও সহকর্মী শিক্ষকদের মধ্যে তিনি তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে দিতেন। ১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ডা. রাব্বী সেই আন্দোলনেও যুক্ত হয়েছিলেন। সহকর্মীদের নিয়ে আন্দোলনরত জনতার সঙ্গে নেমে এসেছিলেন রাজপথে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খুব গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতেন, আহতদের দিতেন ওষুধ ও চিকিৎসাসেবা। তাঁর এসব কর্মকাণ্ড পাকিস্তানি বাহিনীর এ দেশীয় দোসর-রাজাকার-আলবদরদের নজর এড়ায়নি। একসময় তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ওপর নজরদারি চলছে।

১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কারফিউ শিথিল করা হলো। ডা. রাব্বী বললেন, পুরান ঢাকায় একজন অবাঙালি রোগী দেখতে যেতে হবে। স্ত্রী জাহানারা রাব্বী তাঁকে যেতে নিষেধ করলেন। স্ত্রীর কথা শুনে হাসলেন ডা. রাব্বী। বললেন, ভুলে যেয়ো না, আমি একজন চিকিৎসক। স্ত্রী বললেন, কিন্তু তুমি যে রোগী দেখতে যাচ্ছো সে অবাঙালি। স্ত্রীর উদ্বেগের কথা শুনে ডা. রাব্বী হাসলেন। বললেন, সে অবাঙালি কিন্তু তাতে কী। অবাঙালিরাও তো মানুষ। আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতেই হবে। স্ত্রীর নিষেধ শুনলেন না। এরপর যথারীতি রোগী দেখে তাঁর সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় ফিরে এলেন। তখনও কারফিউ শুরু হয়নি। এদিকে টেলিফোনে আত্মীয়স্বজন কারও সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে জাহানারা রাব্বী ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চাইছিলেন সেদিন বিকেলেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেল। তখন বিকেল চারটে বাজে। বাসার বাবুর্চি ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে। বলল, সাহেব, ওরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। ডা. রাব্বী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটা সাদা কাদামাখা মাইক্রোবাস আর একটি জিপ তাঁর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না কারা এসেছে। কিন্তু ডা. রাব্বী তখনও ভাবলেশহীন। তিনি ওদের সাথে গাড়িতে উঠে বসলেন।

এদিকে মিসেস রাব্বী চারদিকে পাগলের মতো টেলিফোন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কর্নেল হেজাজিকে ফোন করলে তিনি জানালেন, ডা. রাব্বী ও ডা. আলীম চৌধুরীসহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০ জন প্রফেসরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অপরাধ তাঁরা পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক। পরদিন ১৬ই ডিসেম্বর সকালে জাহানারা রাব্বী কর্নেল হেজাজিকে আবারও ফোন করেন। হেজাজি জানালেন, ডা. রাব্বী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কী হয়েছে কিংবা তাঁরা কোথায় আছেন তিনি জানেন না। জাহানারা রাব্বী বুঝতে পারলেন কী ঘটেছে। তারপরও তিনি নিরুপায় হয়ে স্বামীর খোঁজে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করলেন। রাজধানী ঢাকার পরিস্থিতি তখন আরও থমথমে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয় নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। এমন অবস্থায় মিসেস জাহানারা রাব্বী রাস্তায় ছোটোখাটো একটা খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে পড়লেন। তারপর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তানি বাহিনী। ঢাকার আকাশ-বাতাস তখন 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত। সেই পরম আনন্দের মুহূর্ত মিসেস রাব্বী কী করে উদ্‌যাপন করবেন! স্বামীর কথা ভেবে জলভরা চোখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হয়ত মনে মনে তিনিও বলতে চেয়েছিলেন, 'জয় বাংলা'। স্বাধীনতার বিজয় অর্জনের একদিন পর ১৮ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া গেল ডা. রাব্বীর লাশ। সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত। মৃতদেহ দেখেই বোঝা যায় হত্যার আগে তাঁকে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর শহিদ সাধনকে স্মরণ করে পাবনা শহরে 'শহিদ সাধন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' নামে দেশের দ্বিতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভের পর ১৯৭২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর শহিদ সাধনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মোচিত হয়। তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী মহাবিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। আর সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শহিদ সাধনের শোকার্ত জননী বেগম সুফিয়া খানম ছিলেন প্রধান অতিথি। মহাবিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান। এরপর বিভিন্ন সময় এই সংগীতাঙ্গনে অনেক কৃতী মানুষের আগমন ঘটেছে। এঁদের মধ্যে আছেন উপমহাদেশের বাংলা গানের কিংবদন্তী গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, রবীন্দ্র গবেষক ড. শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও প্রমথনাথ বিশী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গীতিকার ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

এদিকে ১৯৭২ সালে ডা. ফজলে রাব্বীর নামে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি হলের নামকরণ করা হয় 'শহীদ ডা. ফজলে রাব্বী হল'। এছাড়া তাঁর নামে রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্মারক ডাকটিকিট। ডা. ফজলে রাব্বী, যাঁর হৃদয়জুড়ে ছিল বাংলাদেশ আর এ দেশের অসহায় মানুষের ছবি। স্বাধীনতার ঘৃণ্য পশুরা বেয়নেটে তাঁর হৃদপিণ্ডকে শরীর থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে তাঁকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার মতোই তাঁর স্মৃতি স্বাধীনতার ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকাল।

আসলে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি ঘটনা নয়, আবহমান বাঙালির অধিকার আদায়ের সবচেয়ে বড়ো মাইলফলক। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন কিংবা সাময়িক অস্থিরতা বাঙালির এই মাইলফলক মহান অর্জনকে কখনও নস্যাৎ করতে পারে না। আর তাই কণ্ঠশিল্পী গোলাম সরোয়ার খান সাধন কিংবা ডাক্তার ফজলে রাব্বীর মতো দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে কখনও মুছে যাবার নয়।

শ্যামল দত্ত: লেখক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা dutta209@gmail.com

সুরবালার অন্তিম ইচ্ছে

রফিকুর রশীদ

সুরবালা এখন কী করবে!

কেউ কি তার কথায় কান দেয়, নাকি তার নিষেধ-বারণ মান্য করে! সংসারে সে আবার একটা মানুষ! রোগজর্জর থুত্থুড়ে বৃদ্ধা, ঘাটের মড়া বললেই চলে, ছেলে-বউ, নাতি-পুতি সবার কাছেই সে এখন দুর্বহ বোঝা; কে গুরুত্ব দেয় তার কথার! বছরের পর বছর ধরে সে আছে আপন বৃত্তে শামুকের মতো গুটিয়ে। খোলসের মধ্যে ঘাড়মাথা শুঁড় সেঁধিয়ে যাবার পরও শামুকের চোখ খোলা থাকে কি না সে কথা সুরবালা দাসীর জানা নেই, তবে ঘরের দাওয়ায় জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকলেও সে টের পায়, তার দুচোখ খোলা। গভীর খোঁড়লের ভেতরে ঢুকে গেছে চোখের মণি, তবু সে অনেক কিছু দেখতে পায়। সবকিছু আলো ঝকঝকে ফকফকা হোক বা না হোক, চোখ মেললে প্রায় সব কিছুই দেখতে পায়, বুঝতে পারে। এমনকি রাতের অন্ধকারে চোখের পাতা মুদে এলেও অনেক ছবি ভেসে ওঠে চোখের আয়নায়। ছবির পর ছবি। গোটা জীবনের কত রকম ছবি! সেই ছবিগুলো অবিরাম দাপায়, দগ্ধায়, তাড়িয়ে ফেরে; বাকি রাত আর ঘুমোতেই দেয় না। তখন আর কীইবা করার থাকে তার! নির্ঘুম পাড়ি দেয় রাতের প্রহর।

কিন্তু ভূতের পালের এই জ্বালাতন আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! অমনি তো আর খিস্তি-খেউড় এসে জিভের ডগায় লকলক করে না, করে ওদের অত্যাচারে। কেন, ওই ডালিমগাছের তলায় পেচ্ছাপ না করলে চলে না তোদের! সারা বাড়িতে আর কোথাও জায়গা পাসনে ভূতের পাল? সুরবালা কোমরের ব্যথায় একবার কাঁকিয়ে ওঠার পর মুখে গজর গজর করতেই থাকে– দাঁড়া, আমার মাজার ব্যথা একটু কমুক, সব কটা বাঁদরের নুনু আমি বটি দিয়ে কাটব, হ্যাঁ।

ভূতের পাল বা বাঁদরের পাল– যে নামেই ডাকুক সুরবালা দাসী, ওরা সবাই তার নাতি। দুই পুত্রের সুবাদে চারজন উত্তরাধিকারী। ওদের মধ্যে ছোটো-বড়োর কোনো ভেদাভেদ নেই। কেমন খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে জবাব দেয়,

– নুনু কাটলে তো আমরা মোছলমান হয়ি যাবো ঠাকমা!

সুরবালা তখনও কটকট করে ওঠে,

– হ্যাঁ, মোছলমান হওয়া অতই সোজা!

বালকেরা বেশ বিপন্ন বোধ করে। তাদের এই গোবরডাঙ্গা গ্রামে একঘরও মুসলমানের বাস নেই সত্যি, তবু আশৈশব নানাজনের কানাকানি থেকে হিন্দু-মুসলমানের প্রধান পার্থক্যের ওই স্থূল জায়গাটির কথাই তারা জেনে এসেছে। কিন্তু সুরবালার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা বর্ডারের এপারে মুসলমানপ্রধান গ্রাম তারাপুরে। বলতে গেলে এই তারাপুর আর গোবরডাঙ্গা ছিল একই জনপদ। একটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত, অন্যটি মুসলমান অধ্যুষিত। মাঝখানে ট্যাংরামারির খাল। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সেই খাল বরাবর হয়েছে সীমান্ত বিভাজন।

একদা খাল পেরিয়ে দুই গ্রামের মানুষ মিলিত হতো গ্রাম্য মেলায়-খেলায়, সামাজিক পালাপার্বণে। দুই রাষ্ট্র ভাগ হয়ে যাবার পর দুপারের মানুষের মেলামেশার সম্পর্কটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী এক অদৃশ্য কারণে তারাপুরের হিন্দুপাড়ার অধিকাংশ বাসিন্দা রাতের আঁধারে বর্ডার টপকে ধীরে ধীরে গোবরডাঙ্গা কিংবা আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সুরবালার বাবা নিতাইচরণ দাস মাটি কামড়ে পড়েছিল তারাপুরেই। তার ভাই, ভাইপো, ভগ্নিপতি সবাই একে একে কেটে পড়ে ওপারে, তবু সে একরকম গোঁ ধরেই পড়ে থাকে তার জন্মভিটে আগলে। অথচ একমাত্র কন্যা সুরবালার বিয়ের সময় তার মগজের কোষে জমা হয়ে থাকা ধনুকভাঙা পণ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল কে বলবে সেই কথা! আইবুড়ো মেয়ের বোঝা কি খুবই দুর্বহ হয়ে উঠেছিল! সুরবালার বয়সি অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান যুবকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে জাত-কূল হারায়, বিষপানে কিংবা উদ্বন্ধনে প্রাণ জুড়ায়। সেসব বদনাম ছিল না সুরবালার। সুফিয়া, ফরিদা, আমেনা, সাইফুল, মোস্তফা, এনামুল, জুব্বার– গ্রামজোড়া কত না সমবয়সি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার মাখামাখি। একই সঙ্গে বড়ো হতে হতে কই কারো চোখে তো কখনো পাপের ছায়া দেখেনি! একবার মন্ডলপাড়ার কালাম কুপ্রস্তাব দিতে গিয়ে এনামুল এবং খলিলের হাতে বেশ শায়েস্তা হয়। কিন্তু সে কথা তো অভিভাবকের কানে পৌঁছানোর কথা নয়। অথচ সেবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মাসখানেক আগে গোবরডাঙ্গার কেষ্টদাসের ছেলে বিপিন চোরাপথে বর্ডার টপকে এসে সহসা সুরবালার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই নিতাইচরণ কী ভেবে যে ঘাড়েমাথা দুলিয়ে এককথায় রাজি হয়েছিল, সে ব্যাখ্যা সংসারের কারো পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তারপর এক রাতে স্বামীর হাত ধরে সুরবালা চোরাপথে চলে আসে গোবরডাঙ্গায়। পেছনে পড়ে থাকে স্মৃতিঘেরা তারাপুর। মুসলমান অধ্যুষিত সমাজের অনেক রীতিনীতি, বিধিবিধান সে বুকে পুষে রাখে, তবু তারাপুরে আর যাওয়া হয় না।

যাবার সুযোগ একবার হয়েছিল একাত্তরে। তখন চারদিকে বর্ডার হাট করে খোলা। তাড়া খাওয়া মানুষ ছুটে আসছে বানের স্রোতের মতো। সেই স্রোতের উজানে কেউ কেউ খানিক এগিয়ে যান, পস্তানো লোকজনের খোঁজখবর নিয়ে আসে। সুরবালা কার খোঁজ নেবে? ততদিনে বাবা-মা দুজনেই স্বর্গবাসী হয়েছে। ছোটোভাই দিলিপ রাতের আঁধারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে হাবুডুবু খেয়ে সহযোদ্ধাদের গুলিতে নিকেশ হয়েছে সেই কবে! না, খতম-লাইনের যোদ্ধারা নাকি গুলির অপচয় অপেক্ষা ধারালো অস্ত্রে জবাই করাকেই উত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচনা করে। তা যে-অস্ত্রেই হোক, দিলিপ সমাজতন্ত্রের নামে প্রাণ উৎসর্গ করেছে, এ খবর সিপিএমের চ্যালাদের কাছ থেকে অনেক আগেই জেনেছে সুরবালা। তাহলে আর স্রোত উজিয়ে কার জন্যে যাবে সীমান্তের ওপারে! আর যাই বললেই কি যাওয়া যায়! তার কোলে তখন পিঠোপিঠি দুই ছেলে অখিল আর নিখিল। ওরা যেরকম মা-ন্যাওটা, ওদের ফেলে কোথাও দুদণ্ডের জন্যে পা-বাড়ানোর জো আছে!

তবু একবারের জন্যে তারাপুরে যাবার খুব সাধ হয় তার। সেটা ঠিক জন্মভিটের টানে নয়। টান তার অন্য জায়গায়। নিখিলের জন্মের পরপরই ওদের বাবা নিরুদ্দেশ। ঠিক নিরুদ্দেশ, নাকি দেশান্তরী, তারও কিনারা হয় না। বিপিনের এক জ্যাঠাতো ভাই কোত্থেকে খবর এনে জানায়, ইপিআর-এর হাতে ধরা পড়ার পর সে পাকিস্তানে জেলের ভাত খাচ্ছে। এপার-ওপার ব্ল্যাকের কারবার তার, ওই রকম সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতেও পারে না। তাই বলে সে কত বছরের জেল, কোন জেলখানায় তার অবস্থান দীর্ঘদিনেও সে সবের ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই জানা যাবে না! বছর দুয়েকের মাথায় খবর আসে, বিপিন আর নেই। ইপিআর-এর গুলিতে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে নো ম্যানস ল্যান্ডে। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর খবর তো কত রকমই আসে, মুখ বুজে সবই হজম করে সুরবালা।

কিন্তু এই কলজে চমকানো খবর শোনার পর দুহাতে কপাল চাপড়ে বিলাপ করে, তবু সে সিঁথির সিঁদুর মুছতে রাজি হয় না। একাত্তরের বর্ডার-খোলা দিনে একবার তার মনে হয় ... তারাপুরে গেলে তার যদি কোনোরকম খোঁজখবর পাওয়া যায়! শ্বশুরবাড়ির গ্রাম বলে কথা, কেউ কিছু জানতে তো পারে! নাগালের মধ্যে তারাপুরের মানুষজন পেলে নানান কথা শুধায় আর মনে মনে প্রস্তুতি নেয়, মুসলমানপ্রধান গ্রামে গিয়ে কোন বাড়িতে প্রথমে উঠবে সেই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। হ্যাঁ, অখিলকে রেখে নিখিলকে কোলে নিয়েই তারাপুর থেকে একপাক ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্তপ্রায়, তখনই দিলিপের বন্ধু বাদল হাঁপাতে হাঁপাতে গোবরডাঙ্গায় এসে আছড়ে পড়ে সুরবালার উঠোনে। ঢকঢক করে আকণ্ঠ জল খাবার পর সে জানায় চুয়াডাঙ্গা থেকে আর্মি বেরিয়ে পড়েছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে পশ্চিমে এগিয়ে আসছে। পশ্চিম প্রান্তের গ্রাম জয়নগর, তারাপুর, রঘুনাথপুর পৌঁছুতে আর কতক্ষণ! পাকিস্তান আর্মির অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে বাদল এরই মাঝে যেসব খবর জেনেছে, তার সবটা বলা শেষ না হতেই সে ঘোষণা দেয়– আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবো দিদি। তার আগে দুটো দিন তোমার এখানে থাকতে চাই।

সুরবালার তারাপুরে যাবার পরিকল্পনা উঠল মাথায়, সহসা সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাদলের সেবাযত্ন নিয়ে। ছোটোভাই দিলিপ নেই, তার বদলে এই বাদলকে কাছে পেয়ে সুরবালার বুকের ভেতর উথালপাথাল করে ওঠে। প্রবল আবেগে তাকে আঁকড়ে ধরে। দিলিপের কথা, এমনকি বিপিনের কথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায়। বছর দুয়েকের ছোটো হলেও দিলিপের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা ছিল, তার বিষয়ে ছোটোখাটো অনেক কথাই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারে, কিন্তু দিলিপের জামাইবাবু বিপিনের কী এমন খবরই বা জানে বাদল! হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা অনেক রকম কথা তার কানেও এসেছে বটে, তাই বলে সেসব কথা কি এই মহিলার সামনে বলা চলে! বাদল অপলকে তাকিয়ে থাকে সুরবালার সিঁথির সিঁদুরের দিকে। মুসলমান পরিবারের সদস্য হয়েও সিঁদুর রাঙা সিঁথি দেখতে খুব ভালো লাগে বাদলের। তার মনে হয় সামান্য এই রেখাটি বুঝিবা আলো ছড়ায়, পথ দেখায়। বাদলের এই নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে খুব অস্বস্তি হয় সুরবালার, আবার খুব নিভৃতে আনন্দও হয়। বিস্রস্ত আঁচল গোছাতে গোছাতে সে বলে,

– কী দেখিস ভাই আনমনা হয়ে?

সোজাসুজি উত্তর দেয় বাদল,

– তোমাকে।

সুরবালার ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি, গালে লজ্জার আভা। কুণ্ঠাহীনভাবে বাদল বলে,

– তোমাদের এই সিঁদুর রাঙানো ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে দিদি।

সুরবালা হাসতে হাসতে কটাক্ষ করে,

– এপারে তো সিঁদুরের ছড়াছড়ি, কোথাও যেন আটকা পড়িসনে ভাই।

তামাশার ছলে বলা এমন কথার হয়ত কোনো মানেই হয় না, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল– বাদল যথার্থই আটকা পড়েছে। তারাপুরের মানুষ আটকা পড়েছে গোবরডাঙ্গায়। বিহারের চাকুলিয়া থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধের মধ্যে একটু অবকাশ পেলেই চলে আসে গোবরডাঙ্গায়, অখিল-নিখিলের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা জমিয়ে ফিরে যায় গেরিলা শিবিরে। অখিল-নিখিলের স্নেহময় মামা রণাঙ্গনে এসেই হয়ে যায় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। দুঃসাহসী আক্রমণ রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। শৈশবে মাতৃহারা হয়েছে বলে তার মনোজগতে এমনি গোলমেলে আলোছায়া কাজ করে যে সহযোদ্ধাদের মতো অতি সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের সঙ্গে দেশের উপমিত হবার ব্যাপারটা অনুমোদন করতে পারে না; বরং কেমন অবলীলায় সে ঘোষণা করতে পারে, আমার কাছে দেশ হচ্ছে সুরোদির মতো দুহাতে শাখা, কপালে সিঁদুর। সুরবালা শরমে ম্রিয়মাণ হয়ে বলে, পাগল কোথাকার!

পাগলামির শেষ অঙ্ক যে রাতে মঞ্চস্থ হয়, সে রাতে ওদের যুদ্ধটা ছিল পাটকেলপাতার ব্রিজ ওড়ানোর যুদ্ধ। ব্রিজের দুই পারেই রাজাকারের ক্যাম্প, বেলুচ আর্মিও আছে দুজন করে। একেবারে পাক্কা খবর। ওই ব্রিজটা ওড়াতে পারলেই আর্মিদের মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কাজটা খুবই জরুরি। এ ধরনের জরুরি কাজে বাদল থাকে সবার আগে। সেদিন দুঃসাহসী সেই অপারেশনে ঠিকই সফল হয়, শেষ মুহূর্তে এক রাজাকারের বেপরোয়া গুলিতে বাদল ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। পশ্চিম প্রান্তের অনেক গ্রামই তখন মুক্তাঞ্চল। সহযোদ্ধারা ধরাধরি করে বাদলকে সেদিকেই নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে বাদল

নিজেই। চোখ বুজবার আগে সে উচ্চারণ করে– সুরোদিদি, গোবরডাঙ্গা।

সেদিন অতি প্রত্যুষে হিন্দুপ্রধান গোবরডাঙ্গা গ্রামের সুরবালা দাসীর বাড়ির উঠোনে কবর খুঁড়ে বজলুর রহমান বাদলকে কোনোমতে সমাহিত করা হয়। বাক্যহারা সুরবালা দীর্ঘদিন সেই কবর আগলে বসে থাকে। কেউ কিছু বলতে এলে সে ফিসফিসিয়ে বলে, বিরক্ত করো না। আমার ভাই ঘুমিয়ে আছে। ঘুমোতে দাও। কবে একদিন বাদল নাকি রাতের আঁধারে এসে পেটপুরে ভাত খাওয়ার পর জানিয়েছিল পরের বার এসে প্রাণ ভরে একরাত ঘুমোবে। সে সুযোগ তার হয়নি। সুরবালা তাই কিছুতেই বাদলের ঘুম ভাঙাতে চায় না।

একাত্তরে আর নয়, পরের বছরে মহান বিজয় দিবসে স্বাধীন বাংলাদেশের তারাপুর গ্রাম থেকে বেশ কজন ঝাঁকড়া চুলের যুবক কাঁচা আবেগে পা পিছলে চলে আসে এই গোবরডাঙ্গায়, শহিদ বজলুর রহমান বাদলের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে, গলার রগ কাঁপিয়ে ঘোষণা করে– বীর শহিদের কবর আমরা বাংলাদেশে নিয়ে যাব; আমাদের সরকার নিশ্চয় সেই ব্যবস্থা করবে। মধ্যবয়সি হিন্দু রমণী সুরবালা দাসী চুপচাপ বক্তৃতা শোনে। কবর কীভাবে এক দেশান্তরে তুলে নেওয়া যায়, কবর নাকি কবরের মানুষকেই টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এসব মোটেই জানা নেই তার। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে একবার সে আর্তনাদ করে ওঠে, আমার ভাই যে ঘুমিয়ে আছে! তোমরা ওর ঘুম ভাঙাবা?

বাহাত্তরের ডিসেম্বরে, সেই একবারই মাত্র এসেছিল তারা; তারপর এই দীর্ঘদিনে আর কেউ এ পথ মাড়ায়নি। এরই মাঝে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে কতরকম নাটকের পালা হয়ে গেল, অবাধ সীমান্ত পারাপার তো বারিত হলো পরের বছরেই, কাঁটাতারের বেড়া তুলে দুদেশের সৌহার্দ্যকে কণ্টকিত করা হলো; স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির উত্থান-পতনের কতরকম খবর সেই বেড়া টপকে চলে আসে, কিন্তু শহিদ বাদলের কবরের আর কোনো খোঁজ হয় না। অথচ সুরবালা দাসী বুকে পাথর বেঁধে প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। এই প্রতীক্ষা তার দুই রকমের। এতটা দীর্ঘ সময়েও স্বামীর নিরুদ্দেশ-রহস্যের সুনির্দিষ্ট কোনো কিনারা করতে পারেনি। অনেকে বলেছে বারো বছর পেরিয়ে যাবার পর অপেক্ষা করার আর কোনো মানে হয় না, সিঁথির সিঁদুর সে মুছে ফেলতেই পারে। সিঁদুর পরাটা প্রাত্যহিক অভ্যাস বা আচারে পরিণত হয়েছে। হুট করে সেই আচার থেকে সরে আসা কি অতই সহজ! ভাবতে গেলে বাদলের কথা মনে পড়ে। সিঁদুর রাঙা সিঁথি তার খুব পছন্দ। প্রতীক্ষা তার বাদলের কবরের জন্যে। কবর ধসে সেই কবে মাটিসমান হয়ে গেছে। কবরের এক পাশে ঝাঁকড়া মাথা ডুমুরগাছ ছাতা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য পাশে সুরবালার নিজে হাতে লাগানো ডালিমগাছ। ডালিম ধরে, পাকে, ফেটে যায়, বুলবুলিতে ঠুকরে ঠুকরে খায়; তবু সে ডালিম তার নাতি-পুতিকে কেন যে খেতে দেয় না সে এক রহস্য বটে। অখিল-নিখিলের পৃথক সংসার হবার পর ভিটেমাটি ভাগাভাগি করে নিয়েছে অনেক আগেই।

ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ লেগে আছে কবরের জমিটুকু নিয়ে। সুরবালার জোর দাবি– সামান্য এই জমিটুকু সে ভাগ হতে দেবে না। কাউকে ভোগ করতেও দেবে না। যেমন আছে, তেমনই থাক।

কিন্তু কদ্দিন থাকবে এমন পতিত হয়ে?

এ প্রশ্ন তো মাঝেমধ্যেই ওঠে ঘুরেফিরে। জমিজমার যে রকম দাম উঠেছে, এখন এক ইঞ্চি মাটিও কি এরকম অবহেলায় ফেলে রাখার উপায় আছে! ফালতু এক সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে সুরবালা বাড়ির উঠোনের মূল্যবান জমি আগলে বসে আছে বলেই তার দুই ছেলের ধারণা। কবরের এই জমিটুকু নিয়ে দুজনের বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হলে তাদের মুখে তখন কথার খই ফোটে, আগুনের গোলা বেরোয়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রশ্ন করে মাকে– তুমি কার জন্যে অপেক্ষা করো মা, সত্যি করে বলো দেখি!

সুরবালার গলায় কথা সরে না। চোখের কোটর থেকে মণি ছিটকে বেরোতে চায়। ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে শেষে বলে, আমি আমার কপালের জন্যি অপেক্ষা করি বাবা।

উত্তরটা বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়। অখিল একটু পিছিয়ে এলেও নিখিল নাছোড়। সে বলে,

– বাদল মামা তোমার কে?

সুরবালা নিরুত্তর।

– মুসলমানের কবর আমরা পাহারা দেব কেন?

– পাহারা তো আমি দিই। তোরা চাস সেই কবরের মাটি চষতে।

এগিয়ে আসে অখিল,

– মাটির যে দাম এখন, আমরা মাটি ফেলে রাখব কেন?

– পৈতৃক সম্পত্তি তো সব নিয়েছিস বাবা, শুধু এই জমিটুকু না হয় আমার জন্যিই...

– ওই কবর দিয়ি তুমি কী করবা মা?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু সময় লাগে সুরবালার। সে বুঝতে পারে অখিল কেন কবরের গায়ে গরুর গোয়াল করে, নিখিল কেন গোবর ফেলার সারগর্ত তৈরি করে কবরগুহায়। বেশ বুঝতে পারে সে– বাপ-মায়ের আশকারা পায় বলেই তার নাতি-পুতিরা নুনু বের করে কবরের মধ্যে পেচ্ছাপ করে, ডুমুরতলায় পেট ঝেড়ে পায়খানা পর্যন্ত করতে পারে। সে যত ধমকায়, ওরা ততই দাঁত কেলিয়ে হাসে। ওদের মায়েরা পর্যন্ত ওদেরই পক্ষ নেয়, তারাও নির্লজ্জের মতো হাসে। এসব তামাশার অর্থ সহসা পরিষ্কার হয়ে আসে সুরবালার কাছে। দুই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে,

– তোদের আমি পেটে ধরেছি, মানুষ করেছি, আমার একটা কথা তোদের রাখতে হবে।

মায়ের কথা দুই ভাই কানে তোলে কি না বুঝা যায় না। অখিলের অমীমাংসিত প্রশ্নই নিখিল আবার জোর দিয়ে তোলে– ওই কবর দিয়ি তুমি কী করবা তাই বোলো।

দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সুরবালা ঘোষণা করে,

– ওই কবরে আমি শোব।

স্তম্ভিত দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ওদের গর্ভধারিণী জানিয়ে দেয়– মৃত্যুর পরে আমাকে শ্মশানে নেওয়ার দরকার নেই। তোরা দুই ভাই ধরাধরি করে ওই কবরে নামিয়ে দিস।

———○———

আলোর রানি মহীয়সী রোকেয়া

মুস্তাফা মাসুদ

এক ছিল রানি। কিন্তু তাঁর ছিল না রাজ্যপাট, ঠাটবাট কোনোকিছুই; দাসী-বাঁদী, চাকর-নফর কিচ্ছু ছিল না তাঁর। তারপরও তিনি রানি। তাহলে কেমন রানি ছিলেন তিনি? হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আলোর রানি। জ্ঞান-রাজ্যের মহীয়সী সম্রাজ্ঞী। সবার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার আসনে আসীন এক জ্যোতির্ময় রানি। তিনি ঘরে ঘরে বিলিয়েছেন জ্ঞানের আলো। শিক্ষার জাদুই চেরাগ; বিশেষ করে যে যুগে মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরুতে পারত না– সারাক্ষণ তাদেরকে থাকতে হতো ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। মুসলিম পরিবারের মেয়েদের বাইরে বেরুনো, লেখাপড়া বা কাজকর্ম করা ছিল নিষিদ্ধ– এতে নাকি মস্ত পাপ হয়। এমনি এক সময়ে তিনি মুসলিম মেয়েদের সামনে এলেন আলোর প্রদীপ হাতে। সে আলো জ্ঞানের আলো। শিক্ষার আলো। শত বাধা আর অসুবিধাকে ডিঙিয়ে আলোর ভুবনে, জ্ঞানের রাজ্যে পা রেখেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গী করেছেন শত শত নারীকে; জ্ঞান ও শিক্ষার আলোয় তাদেরকে দেখিয়েছেন আলোকিত নতুন জীবনের পথ। সেই আলোর রানির নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসাইন, সংক্ষেপে বেগম রোকেয়া (১৮৮০–১৯৩২)। অবশ্য পারিবারিক নাম রোকেয়া খাতুন। কিন্তু বেগম রোকেয়া নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত। আমাদের এই বাংলাদেশেরই সোনার মেয়ে তিনি। উত্তরের জেলা রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে তাঁর জন্ম। উল্লেখ্য, সেকালে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ববঙ্গ– ব্রিটিশ শাসনের অধীন একটি অঞ্চল। বেগম রোকেয়ার বাবার নাম আবু আলি সাবের। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রভাবশালী জমিদার। তাঁর বাড়িতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চল ছিল না। সেখানে ছিল আরবি ও ফারসি ভাষার কদর। তাঁদের শিক্ষার মাধ্যমও ছিল আরবি-ফারসি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সেকালে ধনী অভিজাত বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারে বাংলা ভাষাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো না। ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। বাড়ির মেয়েদের বাইরে মুক্তভাবে চলাফেরা, ইচ্ছেমতো লেখাপড়া করার কোনো সুযোগ ছিল না। এমনই এক বদ্ধ পরিবেশে বেগম রোকেয়ার জন্ম। তাঁরা ছিলেন দুই বোন, তিন ভাই। বড়ো বোন করিমুন্নেসা খাতুন ও বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের রোকেয়ার জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেন। করিমুন্নেসার ভারি ইচ্ছে বাংলা শেখার। কিন্তু অভিজাত জমিদার পরিবারের মেয়ে বাংলা শিখবে, এটা পরিবার থেকে মেনে নেওয়া হলো না। এ অবস্থায় এগিয়ে এলেন বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের। তাঁর কাছেই করিমুন্নেসা আর রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি শেখেন।

১৮৯৬ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় উর্দুভাষী উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইনের সাথে। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বিহারের ভাগলপুর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জনাব সাখাওয়াতের মাতৃভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও রোকেয়ার আগ্রহ দেখে তিনি তাঁকে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তিনি রোকেয়াকে সাধারণ জনগণের ভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চারও পরামর্শ দেন। স্বামীর উৎসাহে রোকেয়া এগিয়ে যেতে থাকেন। শেখা এবং লেখালেখির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। অবশেষে ১৯০২ সালে *পিপাসা* নামক একটি বাংলা বই প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর লেখক জীবন শুরু হয়। এখনকার সময়ে কোনো নারীর এমন একটি বই লেখা তেমন কোনো বিষয়ই নয়; কিন্তু আজ থেকে শতাধিক বছর আগে উর্দুভাষী অভিজাত মুসলিম পরিবারের একজন গৃহবধূর জন্য এটা ছিল রীতিমতো এক বিপ্লব; হইচই ফেলে দেওয়ার মতোই এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

কিন্তু রোকেয়ার জীবনের সুখ বেশিদিন সইল না। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসাইন মারা গেলেন ১৯০৯ সালে। এতে রোকেয়া বুকভাঙা দুঃখ পেলেও ভেঙে পড়লেন না বা হতাশার সাগরে হারিয়ে গেলেন না। স্বামী সাখাওয়াত হোসাইন বেঁচে থাকতে রোকেয়াকে উৎসাহিত করতেন মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে। এজন্য টাকাও আলাদা করে জমিয়ে রাখতে বলতেন রোকেয়াকে। তাঁর অকাল মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পর রোকেয়া শোককে পাথরচাপা দিয়ে ভাগলপুরে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বামীর স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখবার জন্য তিনি স্কুলের নাম রাখলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল'। এলাকাটি ছিল সম্পূর্ণ উর্দুভাষী অধ্যুষিত। মাত্র পাঁচজন ছাত্রী পাওয়া গেল আর তাই দিয়েই শুরু হলো রোকেয়ার স্বপ্নের স্কুলের পথচলা। পরে স্বামীর পরিবারের লোকদের সাথে সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাধ্য হয়ে তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় চলে যান এবং একটি বাংলাভাষী অঞ্চলে তাঁর স্কুল পুনরায় চালু করেন। এই স্কুলটি ক্রমে ক্রমে কলকাতার একটি নামি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে স্কুলটি এখনও সুনামের সাথে চলছে। বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত

৯ই ডিসেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল থেকে কত মেয়ে যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় নিজেদের জীবন আলোকিত করেছেন, তার হিসাব করা মুশকিল।

মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীসমাজের কল্যাণের জন্য 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা ইসলামি নারীকল্যাণ সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি নারীদের আত্মবিকাশের লক্ষ্যে বিতর্ক, আলোচনাসভা ইত্যাদির আয়োজন করত। নারীরা শিক্ষিত ও সচেতন হলে তাদের সন্তানেরাও শিক্ষিত ও সচেতন হবে; ফলে এগিয়ে যাবে সমাজ ও দেশ– এ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই রোকেয়া নারীশিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এসেছিলেন ১০০ বছরেরও বেশি আগে। তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিল না। অন্যের সন্তান, বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদেরকে তিনি আপন সন্তানের মতো শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে গেছেন সারা জীবন। নারীর অগ্রগতি-সমৃদ্ধির জন্য রোকেয়া ছিলেন দ্বিধাহীন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর একটি বক্তব্য নারী প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'পুরুষের সমক্ষমতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। অবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিস্ট্রেট, লেডীব্যারিস্টার, লেডীজজ– সবই হইব। ... উপার্জন করিব না কেন?... যে পরিশ্রম আমরা স্বামীদের গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?... আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করিয়া হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না?'

তাইতো তাকে উপমহাদেশের 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণের পাশাপাশি বেগম রোকেয়া সাহিত্যচর্চাও করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যের মূল সুরও ছিল অবহেলিত মুসলিম নারীদের কল্যাণ ও তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রেরণা দান। তাঁর লেখা বইগুলোর নাম: *সুলতানার স্বপ্ন*, *অবরোধবাসিনী*, *মতিচুর*, *পদ্মরাগ* প্রভৃতি। মহীয়সী নারী, শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতের আলোকিত রানি বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশে ৯ই ডিসেম্বরকে সরকারিভাবে 'রোকেয়া দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এছাড়া তাঁর জন্মস্থান পায়রাবন্দে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়'।

আগামী দিনের নাগরিক আজকের শিশু-কিশোররা শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কত সুযোগ পাচ্ছে; তাদের মায়েরা শিক্ষিত ও সচেতন বলেই তারা এত সুযোগ পাচ্ছে। আর তাদের মায়েদের, তাদেরও মায়েদের শিক্ষিত ও সচেতন করতে বেগম রোকেয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাই আমরা সকলেই এই মহীয়সী আলোর রানির কাছে ঋণী। আমরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মুস্তাফা মাসুদ: প্রাবন্ধিক, গল্পকার, শিশুসাহিত্যিক ও অনুবাদক

একাত্তরের অন্যতম অগ্নিবীর

মিয়াজান কবীর

রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ছায়াঢাকা পাখি ডাকা সুনিবিড় সবুজ-শ্যামলিমায় ঘেরা একটি গ্রাম। নাম তার আরাজি তামপাট। এই গ্রামের এক কৃষিজীবী মোহাম্মদ ফইমউদ্দিন মিয়া। তাঁর প্রথম স্ত্রী রহিমননেসার কোলজুড়ে আসে ১৯৪৬ সালের ২রা এপ্রিল এক পুত্রসন্তান। মা-বাবা নবজাতক শিশুপুত্র সন্তানের চোখে-মুখে দেখতে পেলেন আশার আলো। তাই এই ছেলেটির নাম রাখলেন মকবুল হোসেইন। দুই মায়ের ঘরে সাত ছেলে চার মেয়ের মধ্যে মুহম্মদ মকবুল হোসেইন দ্বিতীয় সন্তান। চাঁদের মতো ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটি এক মায়ের বুকে মাথা রেখে আরেক মায়ের কোলে নরম তুলতুলে পা নেড়ে খেলা করে। মায়েদের আদর-সোহাগে এক-পা দু-পা করে বেড়ে ওঠেন মকবুল হোসেইন। মা আর মাটি পরম মমতায় জড়ানো যেন একই সূত্রে গাঁথা।

মকবুল হোসেইনের বড়ো মা রহিমননেসা সাংসারিক দেখাশোনা করেন আর ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার দায়িত্বভার ছিল ছোটো মা জোবেদা খাতুনের। ছোটোবেলায় মকবুল হোসেইনের বর্ণমালায় হাতেখড়ি তাঁর ছোটো মায়ের কাছে। বর্ণমালা শেখার মধ্য দিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন মকবুল হোসেইন। ধাপে ধাপে তিনি প্রাইমারি ছাড়িয়ে নাম লিখালেন হাইস্কুলে। আফানউল্লাহ হাইস্কুল থেকে ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মকবুল হোসেইন ভর্তি হন কারমাইকেল কলেজে। এই কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অর্জন করেন বিএসসি ডিগ্রি। মকবুল হোসেইন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর ছিল পদচারণা। তিনি স্কুল ও কলেজ ম্যাগাজিনে লিখতেন সায়েন্স ফিকশন। সম্পাদনা করতেন হাতে লেখা *পদক্ষেপ* নামে দেয়াল পত্রিকা। এই দেয়াল পত্রিকাটি পরবর্তীতে *পদক্ষেপ* নামেই স্কুলবার্ষিকী হিসেবে প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর লেখা 'কয়লা' ও 'চিকিৎসার পাশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি' নামে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সুধীমহলে প্রশংসিত হয়।

মকবুল হোসেইন ছাত্রজীবনে রাজনীতি সচেতন ছিলেন। আফানউল্লাহ হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক সাহেব ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংস্পর্শে এসে মকবুল হোসেইন আরও সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। ছাত্রলীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিছিলে, সভায় অংশগ্রহণ করেন। ছয় দফা ও এগারো দফা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। এছাড়াও খেলাধুলার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে খেলাধুলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজয়ীদের মধ্যে শিল্ড-কাপ উপহার দিতেন।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধকালীন সময় মকবুল হোসেইন 'ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি'-তে কাজ করেন একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সমাজের এক শ্রেণির কুচক্রীমহল যুদ্ধের অজুহাতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে কিংবা অসামাজিক কার্যকলাপে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে যাতে না পারে সেদিকে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখতে তিনি পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা।

মকবুল হোসেইনের মনপ্রাণ ছিল জ্ঞানপিপাসু। আলোর অভিসারী কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মধ্যে জ্ঞানের অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত করার মানসে তিনি শিক্ষকতা করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। তিনি কিছুদিন বড়ো রংপুর কারামাতিয়া মাদ্রাসা ও আফানউল্লাহ হাইস্কুলে দায়িত্ব পালন করেন অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে। সহজ সুন্দর উপমায় নিরস বিজ্ঞানশাস্ত্রকে প্রাণবন্ত সরস উপস্থাপনার মাধ্যমে উৎসাহী করে তুলেন ছাত্রছাত্রীদের। আপন প্রতিভাবলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রিয় হয়ে ওঠেন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সহকর্মীদের কাছে। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষকের স্থায়ী পদ না থাকার দরুন এখানে তাঁর বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি।

একদিন পত্রিকার পাতায় ইস্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এ (বর্তমান বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স) স্টেশন অফিসার পদে লোক নিয়োগের একটি বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি পড়ে মকবুল হোসেইনের। গতি-সেবা-ত্যাগ– এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ১৯৬৮ সালে যোগদান করেন চাকরিতে। অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নীলফামারী ফায়ার স্টেশনে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে।

নীলফামারীতে চাকরিতে যোগদানের পর পরিচয় হয় আনসার অ্যাডজুট্যান্ট আহমদ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি মকবুল হোসেইনের ভদ্রোচিত আচার-আচরণে এবং তাঁর সুষমামণ্ডিত দীপ্তিময় অবয়ব দেখে মুগ্ধ হন। তিনি পারিবারিকভাবে প্রস্তাব দেন তার মেয়ে শামসুন্নাহারের সঙ্গে বিয়ের জন্য। মকবুল হোসেইনের মা-বাবার সম্মতিতে ১৯৬৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। মকবুল

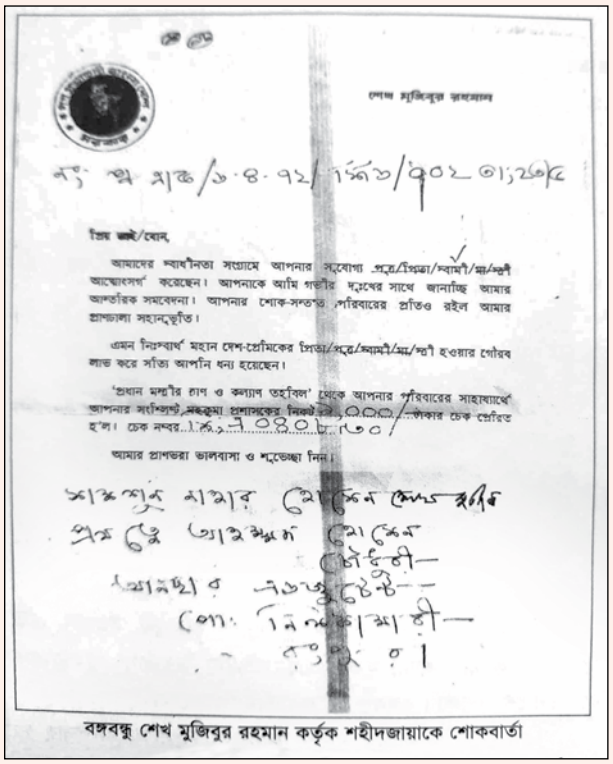

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক শহীদজায়াকে শোকবার্তা

হোসেইন দাম্পত্য জীবনে ১৯৭১ সালে এক কন্যা লাভ করেন। কন্যার নাম রাখা হয় মুর্শেদা খানম শিখা।

কালের খেয়ায় আসে ১৯৭১ সাল। একাত্তরের ২৫শে মার্চ বাঙালির জীবনে একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। হানাদারবাহিনী বর্বরতার বিরুদ্ধে বাঙালি ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রতিরোধ যুদ্ধ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে বাঙালি ইপিআর সৈনিকদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন অকুতোভয় বীর অগ্নিসেনা মকবুল হোসেইন। হানাদারবাহিনীর ভারি অস্ত্রশস্ত্রের মুখে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ঢুকে পড়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে। ফলে বাঙালি সৈনিকরা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পেছনে চলে যায়। এরপর মকবুল হোসেইন তাঁর জিপ গাড়িতে বাঙালি ইপিআর সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্রসহ পৌঁছে দেন নিরাপদ স্থানে। কিছুদিন পর মকবুল হোসেইন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যান ভারতে। ভারতে গিয়ে তাঁর স্কুলজীবনের শিক্ষক, তৎকালীন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। মকবুল হোসেইন একজন সুশৃঙ্খল ইউনিফর্মধারী ফায়ার সার্ভিস বিভাগের কর্মকর্তা। সেই হিসেবে তাঁকে শারীরিক প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি আন্তরিকভাবে দেশ ও জাতির মুক্তির লক্ষ্যে দক্ষতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেন।

১লা মে মুক্তিযুদ্ধের হাইকমান্ডের নির্দেশে হানাদারবাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফিরে আসেন। তথ্য সংগ্রহ করে ফেরার পথে ধরা পড়েন হানাদারবাহিনীর হাতে। ক্যাম্পে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। মকবুল হোসেইনের কাছ থেকে কোনো তথ্য বের করতে না পেরে তাঁর ওপর চালানো হয় প্রচণ্ড নির্যাতন। তারপর তাঁকে মহানন্দা নদীর পাড়ে বর্বর বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। একজন দেশপ্রেমিকের রক্তে রঞ্জিত হয় মহানন্দার জলরাশি। একজন অগ্নিবীর মকবুল হোসেইন দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গ করেন নিজের অমূল্য জীবন। তাঁর বুকের রক্তে খচিত হয়েছে সবুজ জমিনে লালসূর্য। দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালির ললাটে সূচিত হয়েছে বিজয় তিলক। রচিত হয়েছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। একাত্তরের এক অগ্নিবীর মকবুল হোসেইনের রক্ত-ঋণ কোনো দিন শোধ হবার নয়।

মিয়াজান কবীর : লেখক ও গবেষক

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেল ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র

ইউনেস্কোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার কাসানে শহরে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিষয়ক ২০০৩ কনভেনশনের চলমান ১৮তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় ৬ই ডিসেম্বর এ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

জামদানি বয়ন শিল্প, শীতলপাটি বয়ন শিল্প, বাউল গান ও মঙ্গল শোভাযাত্রার পর প্রায় ৬ বছরের বিরতিতে বাংলাদেশের পঞ্চম অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র এ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ স্বীকৃতির ফলে বিগত আট দশক ধরে চলমান রিকশা চিত্রকর্ম একটি বৈশ্বিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ করল।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও সচিব খলিল আহমদ এ অর্জনকে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান হিসেবে অভিহিত করেন। এছাড়াও, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ও প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের রিকশাচিত্র ইউনেস্কোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর সভায় উপস্থিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য, উপস্থিত মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূতসহ শতাধিক দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দন জানান এবং এ চিত্রকর্মের বৈচিত্র্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশে তাদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। এ অর্জনের মাধ্যমে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। এর আগে, ১৫ই নভেম্বর ৪২তম সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের এ ধারাবাহিক সাফল্যকে সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অগ্রযাত্রা হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রতিবেদন : শাওন আহমেদ

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন– পিআইডি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে হই ঐক্যবদ্ধ

সৈকত নন্দী

৯ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের ন্যায় চ্যালেঞ্জিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকার দুর্নীতি দমন ও সুশাসনের অনুশাসন দিয়েছে। জাতিসংঘ ২০০৩ সালের ৯ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ঘোষণা করে। সে হিসাবে এবার ২১তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস। ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশনের (আনকাক) মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে জাতিসংঘ। বাংলাদেশ ২০০৭ সাল থেকে সংস্থাটির সদস্য। বাংলাদেশ আনকাকের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন শুরু করে। সরকারিভাবে ২০১৭ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের বার্তা দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। এবারের প্রতিপাদ্য– 'উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ'। এ দিবসের উদ্বোধন উপলক্ষে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস বরাবরের মতো এবারও ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলায় বড়ো পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। একইসঙ্গে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি-আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রদর্শনী, মানববন্ধন, সেমিনার ও আলোচনাসভা এতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক সংগঠন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বাইরে সারাদেশে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দৃশ্যমান ও উন্মুক্ত স্থানে দুর্নীতিবিরোধী বাণী সংবলিত ব্যানার স্থাপন, জাতীয় পতাকা ও দুদক পতাকা উত্তোলন, ফেস্টুন-বেলুন উড়ানো, বর্ণাঢ্য মানববন্ধন, আলোচনাসভা এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়ের আয়োজনে ব্যাপক জনসমাগম হয় এমন স্থানে দুর্নীতিবিরোধী তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে দুদক দিবসটি উদ্‌যাপন করে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্ল্যাকমার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও

দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে...।' ২০শে মার্চ ২০২৩ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা বার্ষিক প্রতিবেদনের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ উক্তিটি তুলে ধরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মাহবুব হোসেন বলেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বড়ো বাধা যা সমাজের উন্নয়নের সব ক্ষেত্রকে দুর্বল করে দেয়। আইনের শাসনকে বিঘ্নিত করে ও দরিদ্রতাকে উসকে দেয়। সম্পদের অবৈধ ব্যবহার সহজতর করে এবং সশস্ত্র সংঘাতের জন্য অর্থায়ন করে শান্তি প্রক্রিয়াকে বিনষ্ট করে দেয় দুর্নীতি।

আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা করেছিল। মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। চতুর্থবারের মতো পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর ১৩ই জানুয়ারি ২০১৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে কার্যালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং এর অর্জনসমূহ সমুন্নত রাখার জন্য সরকার দুর্নীতিবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি ও মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় দুদক কার্যালয় প্রাঙ্গণে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩' উদ্বোধন করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তীতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে দুর্নীতিবিরোধী সুনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যারা দুর্নীতিতে জড়িত, তাদের আত্মশুদ্ধি চর্চা করতে হবে; আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে; তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ ও গণমাধ্যমের সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

দুর্নীতিবিরোধী আইনকানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এসব বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। চরিত্রনিষ্ঠা আনয়নের জন্য মানুষের জীবনের একেবারে শুরু থেকেই তথা পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতা জাগ্রত করতে বিদ্যালয়ে 'সততা স্টোর' করার উদ্যোগ নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 'সততা স্টোর' এমন একটি দোকান যেখানে কোনো বিক্রেতা থাকে না। ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে উল্লিখিত মূল্য বাক্সে রেখে চলে যান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।' স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুর্নীতি শুধু বাংলাদেশের নয়, দুর্নীতি বৈশ্বিক সমস্যা। মানুষের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চেতনা তৈরি ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই বলেও মনে করেন সুধীমহল। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দায়িত্ব পালনে সুনাম বৃদ্ধিসহ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করুক। দুর্নীতি দমনে জয়ী হোক অদম্য বাঙালি। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হোক আপামর জনগণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান সুদৃঢ় হোক। দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা হই ঐক্যবদ্ধ এবং দেশ হোক দুর্নীতিমুক্ত– এই প্রত্যাশাই করি কায়মনোবাক্যে।

সৈকত নন্দী : ব্যাংকার ও প্রাবন্ধিক

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

প্রতিবন্ধী দিবস

মনোয়ারা বেগম

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ৩রা ডিসেম্বর সারাদেশে ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক এই দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এসজিডি অর্জন'। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধিশীল সমাজ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং 'নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন দুটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবাধ চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগসহ সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাঁর বাণীতে বলেন, সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে অত্যন্ত আন্তরিক। এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, সমন্বিত প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, থেরাপি সেবা সহায়তা প্রদান, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কার্যে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সুরক্ষা এবং তাদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার পথ সুগম হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯(১) নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করেছেন। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তাদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ন্যায় বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। দেশের প্রতিবন্ধী ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় থেরাপিউটিক সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৪৫টি ভ্রাম্যমাণ মোবাইল রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি ভ্যান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার পথ অবারিত করতে সারাদেশ ৭৪টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে ঢাকার মিরপুরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স (সুবর্ণ ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করতে প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলার সাভারে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটোরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টার হোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে থেরাপিউটিক ও রেফারেল সেবা প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ২০১০ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৮২০০৯৯ জন এবং সেবা সংখ্যা ১০৬৫১৫৫৫টি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ২০১৪ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৪৯০৯৮৬ জন এবং সেবা সংখ্যা ১২৪১৫৫৯টি।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তিকে ৩১৯৮৮টি ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সারাদেশে ৭৪টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। উক্ত স্কুলসমূহে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০,৮৯৮ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। ঢাকা শহরের ফাউন্ডেশন কার্যালয় মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা, যাত্রাবাড়ি এবং রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, গাইবান্ধা জেলা ও সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় একটিসহ মোট ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে মোট ১৬০ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু লেখাপড়া করছে।

প্রতিবন্ধী মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সকলের উচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল আর্থসামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, তবেই প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদে পরিণত হবে।

মনোয়ারা বেগম: প্রাবন্ধিক

১৪৬টি সেবা মাইগভ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভুক্ত ২৭টি সেবাসহ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার মোট ১৪৬টি সেবা ডিজিটালাইজড করে ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম মাইগভ-এ যুক্ত করা হয়েছে। ৭ই নভেম্বর সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলো যুক্ত করা হয়েছে। 'বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ মাইগভ প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্তকরণ' বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রউফ।

মন্ত্রী বলেন, আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভুক্ত ২৭টি সেবাসহ দপ্তর ও সংস্থার মোট ১৪৬টি সেবা ডিজিটালাইজড করে সেবাগুলোকে মাইগভ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে সকল সেবা একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে গ্রহণ করা যায়। এটা সত্যিই খুব আনন্দের বিষয়। তিনি বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের অবদান, এক ঠিকানায় সব সমাধান' –এ স্লোগান নিয়ে মাইগভ অ্যাপটি ২০২০ সালে উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর লক্ষ্য বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সরকারের নেওয়া নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। মন্ত্রী আরও বলেন, 'হাতের মুঠোয় সরকারি সেবা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরকারি সেবাগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জন্য 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কার্যক্রম চালু হয়েছে। এই 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য অনলাইনে আবেদন এবং সেবা নিতে পারছেন।

প্রতিবেদন: নিলয় হোসেন

বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি

জেসিকা হোসেন

পরিযায়ী পাখিকে পরিব্রাজক বা যাযাবর পাখিও বলা হয়। পরিযায়ী পাখি বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি, যারা শীতের সময় বহু পথ পেরিয়ে আমাদের দেশে আসে এবং কিছু দিন অবস্থান করে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, পরিযায়ী প্রজাতি অর্থ ওই সব বন্যপ্রাণী, যারা এক বা একাধিক দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় আসা-যাওয়া করে থাকে। পৃথিবীতে প্রায় ১২ হাজার প্রজাতির পাখি আছে, যার এক-তৃতীয়াংশই পরিযায়ী পাখি। বাংলাদেশে ৭০০-এর অধিক প্রজাতির পাখির দেখা পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রায় ৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে।

পাখিরা বিভিন্ন কারণেই পরিযায়ন করে থাকে। যেমন:

১. প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ;
২. পর্যাপ্ত খাদ্যের জন্য;
৩. নিরাপদ প্রজননের জন্য;
৪. বংশানুক্রমিক ধারাও হতে পারে।

রাজশাহীর চরাঞ্চলে নীল-গলা ফিদ্দা (Bluethroat), সাইবেরীয় চুনিকণ্ঠী (Siberian Rubythroat) পাখিরা আসে প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে। নীললেজ সুঁইচোরা (Blue tailed Bee Eater) পাখিরা ভারত উপমহাদেশজুড়ে পরিযায়ন করে উপযুক্ত প্রজনন ভূমির খোঁজে। ইউরোপ থেকে লম্বা লেজ তিশা বাজ (Long Legged Buzzard), মঙ্গোলিয়া থেকে স্টেপ ঈগল (Steppe Eagle) বাংলাদেশে আসে সহজ খাদ্য শিকারের জন্য। বেশিরভাগ জলচর পাখি পরিযায়ন করে সমুদ্রের সীমারেখা ধরে। এদের মধ্যে কিছু পাখি বঙ্গোপসাগর থেকে নদীর উজানে উড়তে উড়তে বিভিন্ন জলাশয়ে আশ্রয় নেয়। সারস, ঈগল, বাজসহ বেশ কিছু পরিযায়ী পাখি মধ্য ও উত্তর ইউরোপ থেকে সরাসরি ভারতীয় উপমহাদেশে পরিযায়ন করে। পরিযায়ী পাখিদের এক বিস্ময়কর প্রজাতি দাগী মাথা রাজহাঁস (Bar-headed Goose)। পাখি বিজ্ঞানীদের মতে, এরা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে উড়তে সক্ষম। বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখিদের একটি বড়ো অংশ ঘাসবনের পাখি। এরা সাধারণত রাতের বেলা অন্ধকারে দল বেঁধে পরিযায়ন করে। পাখি বিজ্ঞানীদের মতে, এরা মূলত শিকারি পাখিদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে রাতের অন্ধকারে পরিযায়ন করে।

পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস। এদের মধ্যে বাংলাদেশে ১৭ প্রজাতির হাঁস পরিযায়ন করে। পরিযায়ী পাখিগুলো আমাদের দেশে বিল-ঝিল, হাওর-বাঁওড়, হ্রদ, নদনদী, নালা, সাগর ও জলাভূমিতে বাস করে থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের ধারণা, পরিযায়ী পাখি মূলত মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিযায়ী পাখিরা ভাসমান জলজ উদ্ভিদ, ক্ষতিকর কীট -পতঙ্গ ও পোকামাকড়, শামুক, ব্যাঙাচি, জলজগুল্ম, শ্যাওলা ইত্যাদি খেয়েও জীবনধারণ করে। কিছু পরিযায়ী পাখি ছোটো মাছ খেয়ে থাকে। পরিযায়ী পাখিরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রশান্তির জন্যই আমাদের দেশে আসে না। আমাদের দেশে অতিথি হয়ে আসা এসব পাখি নানাভাবে আমাদের উপকারও করে চলেছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু এ দেশের একশ্রেণির মানুষ অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা ও আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য পরিযায়ী পাখি শিকার করে।

বাংলাদেশ সরকার পরিযায়ী পাখি/বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে। সেই আইনের ধারা ৩৮-এর (১ ও ২) অনুযায়ী পরিযায়ী পাখিকে আঘাত করা, দখলে রাখা, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহণ, মাংস ভক্ষণ, এয়ারগান দিয়ে শিকার, বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে ধরা, প্রজননের সময় বিরক্ত, ডিম নষ্ট ও হত্যা করা ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার সর্বোচ্চ শাস্তি ২ বছর কারাদণ্ড অথবা ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় নিধন করে। পরিযায়ী পাখি ফুল ও শস্যের পরাগায়ন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শীতের সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির আগমনে নৈসর্গিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পরিযায়ী পাখির বিষ্ঠা জমিতে পড়ার ফলে জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি পায়। জমিতে নাইট্রোজেনের আবির্ভাব ঘটিয়ে জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পরিযায়ী পাখি পানিতে সাঁতরানোর ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরিযায়ী পাখির বিষ্ঠায় মাছের খাবার তৈরি হয়, ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, পরিযায়ী পাখির দৈহিক সৌন্দর্য, আকাশে উড়ার দৃশ্য, বৈচিত্র্যময় জীবনাচরণ মানুষকে বিনোদন দেয়।

গত এক যুগ ধরে পরিযায়ী পাখি গবেষণায় বাংলাদেশ অনেক সফল হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কনজারভেশন ফর নেচার (আইইউসিএন) ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারির তথ্যমতে, গত পাঁচ বছর দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা গড়ে ৮৫ হাজার বেড়েছে। পরিযায়ী পাখি শুমারির তত্ত্বাবধায়ক ইনাম আল হক জানায়, টাঙ্গুয়ার হাওর, দোসার চর, হাকালুকি হাওর, বাইক্কার বিল ও সোনাদিয়া দ্বীপে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পাখি থাকে। আমাদের দেশে প্রায় ৭৩৬ প্রজাতির পাখি আনাগোনা করে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। আইইউসিএন ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারি অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১ লাখ ১২ হাজার পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫ হাজার। ২০১৩ সালে প্রায় ৮০ হাজার। আইইউসিএন তথ্যমতে, টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর এলাকায় অতিথি পাখি আসা বেড়েছে। এক সময়ে পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল বাইক্কার বিলে পাখি আসা কমে গেছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল ছিল মৌলভীবাজারের বাইক্কার বিল। টাঙ্গুয়ার হাওর পরিযায়ী পাখির জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থান। এই জলাশয়টিকে জাতিসংঘের রামসার কর্তৃপক্ষ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে ২০০০ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর থেকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে। বিশ্বের অসংখ্য দেশের মধ্যে পরিযায়ী পাখির জন্য সুন্দর অভয়আশ্রম হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি নদনদী, হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিলে এসব পাখিদের বিচরণ লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্টদের মত অনুযায়ী পাখির উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করছে। কেননা এরা স্বল্পকালের জন্য হলেও আমাদের প্রকৃতিতে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সার্বিক পরিবেশকে নতুন রূপদান করে। পাখির সৌন্দর্য, কলতান, পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো আদিকাল থেকেই মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে আসছে। পরিবেশ পর্যটনের জন্য বাংলাদেশের যে কয়টি স্থানে পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে সেসব স্থানে পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকি পরিযায়ী পাখির এক নম্বর আবাসস্থল। এছাড়া বাইক্কার বিল, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, নীলফামারী জেলার নীলসাগর, ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্যান, মিরপুর সিরামিক লেক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জলাশয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পুটিয়ার পচামাড়িয়া, সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওর, দিনাজপুরের রামসাগর, বরিশালের দুর্গাসাগর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership)-এর সদস্য হয়েছে এবং ৫টি এলাকাকে Flayway sile ঘোষণা করেছে।এর মধ্যে রয়েছে– টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ। এ সকল এলাকায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়ার্ল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation প্রদান করা হচ্ছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকাকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় Ecological Critical Area ঘোষণা করেছে। এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ বেড়েছে।

পাখি আমাদের সম্পদ বা ঐশ্বর্য। পরিযায়ী পাখি হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের দূত। বিশুদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখতে পরিযায়ী পাখিদের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন এবং এদের বিষ্ঠার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বাড়ে। তাই এদের সংরক্ষণ করা জরুরি।

জেসিকা হোসেন: প্রাবন্ধিক

বৈশ্বিক অভিযোজন অ্যাওয়ার্ড পেল বাংলাদেশ

দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৮) উন্নয়নশীল অর্থায়ন উদ্ভাবন বিভাগে গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (জিসিএ) লোকালি লিড অ্যাডাপটেশন (এলএলএ) চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

৫ই ডিসেম্বর রেজিলিয়েন্স হাবে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করা হয়েছে। পুরস্কারটি উন্নয়ন অর্থায়নের উদ্ভাবনী পদ্ধতির জন্য ছিল। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। এটি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত স্থানীয় সরকারের একটি উদ্যোগ, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, ডেনমার্ক, জাতিসংঘের মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইউএনসিডিএফ) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্বারা বাস্তবায়িত একটি যৌথ প্রচেষ্টা। ২০২২ সালে জিসিএএলএলএ চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ডস দেওয়া শুরু হয়েছে। এর লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য সৃজনশীল, প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য স্থানীয়ভাবে পরিচালিত প্রকল্পগুলোকে আলোকিত করা, যেখানে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য দুর্বল গোষ্ঠী এবং জনসংখ্যাকে সমর্থন করার ওপর আলোকপাত করা হয়।

প্রতিবেদন : মালিহা তাবস্‌সুম

বিজয় দেখেছি

শারমিন জিকরিয়া

ঝলমলে বিকেল। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মা রান্নাঘরে চাউল ভাজছেন। বৃষ্টির দিনে চাল ভাজা খেতে খুব মজা। আমার বাবা ঢাকা শহরে রিকশা চালাতেন, আমি মা আর বাবা, এই তিনের সংসার আমাদের। একদিন বাবা নিরুদ্দেশ হলেন। আমরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এলাম। আজিমপুর বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে পলাশী বাজার। বাজারের উত্তর দিকে রেলপাটি বিছানো। রেললাইনের দুপাশে বস্তি। নোংরা পরিবেশ। এখানকার ঘরগুলো নীচু, বেড়ার ছাউনি। টিনের ফোকল দিয়ে আকাশ দেখা যায়। এই বস্তিতে আমাদের বাস। মা বাসা-বাড়িতে কাজ করেন। আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ফ্ল্যাস্ক হাতে চা বিক্রি করি। আদা কুচি দিয়ে রং চা বড়োই সুস্বাদু।

শহরে এখন পালাক্রমে মিছিল চলেছে। স্লোগান আমার খুব ভালো লাগে– 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'; 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'– আরও কত স্লোগান। শহরে এখন ধরপাকড় চলছে। চা বিক্রি বন্ধ। মায়ের পারমিশন ছাড়া ঘর থেকে বেরুনো যাবে না। মাঝে মাঝে দরজার কাছে এসে দাঁড়াই, কচ্ছবের মতো গলা উঁচিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখি, আবার ঘরে ঢুকি।

আরেফিন ভাইয়ের ডায়েরিখানা নিয়ে বিছানায় এসে বসলাম। ডায়েরির পাতায় চোখ রাখলাম। ওমা এ-যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ– 'জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে আমি ফাঁসির কাষ্ঠে যাইতেও দ্বিধা করিবো না। বহুবার জেল খাটিয়াছি, অসংখ্য রাজনৈতিক মামলা এবং সর্বশেষ তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হইয়াছি। কিন্তু কখনও মাথা নত করি নাই। কোনো নির্যাতন, জেল-জুলুম আমাকে জনগণের অধিকার আদায়ের পথ হইতে দূরে সরাইতে পারিবে না।'

মা মেঝেতে বসে কাঁথা সেলাই করতে করতে বললেন, মুখটা অত বেজার ক্যান, কী হইছে?

বললাম, সেই কবে জেল থন ছাড়া পাইছি। অহনও ঘরে বইসা আছি। একবার তো বাইরে যাইবার দাও।

– ঠিক আছে যা। তয় বেশি দেরি করিস না।

আমি ফিক করে হেসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলাম। মা স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখলাম।

পলাশী বাজারের সামনে এলাম। এসএম হলের রাস্তার দুপাশে বড়ো বড়ো গাছ। ছাত্ররা গাছের ডাল কাটছে। উৎফুল্ল জনতা জেগে উঠেছে।

শুরু হলো ব্যারিকেড দেওয়ার পালা। এসব দেখে আমার মনে আনন্দ যেন আর ধরে না।

হঠাৎ বিকট শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্দুকের গুলি, কামানের গর্জন শোনা গেল। সেই সাথে দূর থেকে বাঁচাও বাঁচাও আত্মচিৎকার, লোকজন ছুটাছুটি শুরু করে দিলো। বস্তিতে ছুটে এলাম। এখানের বেড়ার ঘরগুলোতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ঘরে ঢুকে দেখি কাঁথায় মুড়ানো মায়ের দেহ তখনও জ্বলছে। মাকে কোলে তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার হাত এবং শরীরের একাংশ পুড়ে গেল। মাকে বাঁচানো গেল না।

আবারও গুলির শব্দ, সবার সাথে আমিও প্রাণের ভয়ে ছুটতে শুরু করলাম। এখানে-সেখানে লাশ পড়ে আছে। গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলেছি। যে করেই হোক আমাকে বাঁচতে হবে, শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। মা-মাটি-মানুষকে বাঁচাতে হবে।

২

দেশের হয়ে লড়াই করার সুযোগ পাবো, এই একটি ভাবনা মাথায় রেখে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছি। ট্রেনিং করে যাচ্ছি। দর্শনার

কাছে কমলাপুর ক্যাম্প। সেখানে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সব রকম কায়দাকানুন, অস্ত্র চালানো থেকে শুরু করে ক্রলিং করে এগিয়ে যাওয়া, ছুটে গিয়ে পল্টি খেয়ে পরা, গ্রেনেড ছুড়ে মারা, কাদাজলে সারারাত ডুবে থাকা– সব ধরনের পরীক্ষায় পাস করে অবশেষে আমি যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেলাম। আমাদের তিনজন কিশোরকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করে বাংলাদেশে পাঠানো হলো।

শনিবার দিন। আম্রকাননে এসে দাঁড়ালাম। শহিদুল, বাবুল মাঠ পেরিয়ে গাছতলায় এলো। অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে ওখান থেকে আমরা ডেমরার বোলতলায় এসে পৌঁছুলাম।

একটি ভাঙা নৌকায় একজন জটাধারী বাউল বসে আপন মনে গান গাইছে। আমরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গান থামিয়ে সে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

বললাম, ভারত থেকে।

– কোথায় যাবে?

– ঢাকায়। একটু থেমে বললাম, আপনি কি ঢাকায় যেতে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?

– রাতে এ পথ দিয়ে সবজির ট্রাক ঢাকায় যায়। তোমরা চাইলে আমি ড্রাইভারের সাথে কথা বলেতে পারি।

– তাহলে তো ভালোই হয়।

একটু পর ভেঁপু শব্দে একটি ট্রাক রাস্তায় এসে থামল। বাউল গাড়ির কাছে গেল। ড্রাইভার গাড়ির জানালায় গলা বের করে এদিক-ওদিক তাকালো। হাত ইশারায় আমাদের কাছে ডাকল। কাছে যেতেই বলল, তোমরা আমার সাথে যেতে চাইলে যেতে পারো তবে, সবজির ভেতর লুকিয়ে যেতে হবে। রাস্তায় মিলিটারিদের চেকপোস্ট আছে।

শহিদুল বলল, আমরা তোমার সাথে যাবো, নিশ্চয় যাবো।

আমরা সবাই ট্রাকে উঠে বসলাম। শাঁ শাঁ বেগে ট্রাক চলছে।

যাত্রাবাড়ি, পেট্রোল পাম্পের পেছনে জলাভূমি, ঝোপঝাড়। ট্রাক থামল। আমরা সবজির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম। ড্রাইভার বলল, তোমরা দক্ষিণের পথ ধরে হেঁটে যাও। কিছু দূর হেঁটে গেলে 'বিসমিল্লাহ' হোটেল। আমি এখন আসি।

ড্রাইভার বিদায় নিলো।

থলে হাতে আমরা সামনের দিকে হেঁটে চলেছি। কিছু দূর গিয়ে বিসমিল্লাহ হোটেলের দেখা পেলাম। একচালা ঘর। কয়েকটি চেয়ার-বেঞ্চ পাতা আছে। দশ/এগারো বছরের একটি শিশু আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

উঠলাম, আমরা বায়োজিত ভাইয়ের কাছে এসেছি।

শিশুটি চলে গেল।

খাবার হাতে একজন যুবক এলো। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বায়োজিত ?

সে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। থলেটি তার হাতে দিলাম। সে বলল, এসো আমার সাথে এসো।

হোটেলের ভেতর দিয়ে পথ। ঘরের ভেতর ঘর। আমরা ওর সাথে হেঁটে গেলাম। ঘরের এখানে-সেখানে ভাঙা বেড়া, টিনের ছিদ্রপথে আকাশ দেখা যায়। থলের ভেতর থেকে চিরকুট বের করে সে পড়তে বসল। হঠাৎ পাখির ডাক শোনা গেল। দুই-তিনজন যুবক ঘরে ঢুকল। বাবুল ও শহিদুল মাটিতে শুয়ে পড়ল। বায়োজিত ভাই বলল, তোমার নাম কী?

বললাম, আমার নাম আবুল হোসেন।

এতটুকু বয়সে যুদ্ধ করবে, ভালোই তো। যাও তুমিও বিশ্রাম নাও বলে সে তার সাথিদের সাথে আলাপে বসল।

মাটিতে দাগ কেটে কী সব চিত্র তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম অপারেশনের পূর্ব পরিকল্পনা। মনে মনে হেসে উঠলাম।

সপ্তাহ খানেক গত হতে চলেছে আমাদের এখানে আসা। মুক্ত আকাশে দুদণ্ড বসবো তারও উপায় নেই। কঠিন বারণ। দিনে হোটেলে কাজ করি, রাতে বায়োজিত ভাইদের সাথে আকাশবাণী কলিকাতার চরমপত্র শুনি।

রেডিও পাকিস্তান ছিল হানাদারবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তারা সেখান থেকে অপপ্রচার চালাতো। শনিবার। মুক্তিযোদ্ধারা ঝুঁপড়িতে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছে। বাবুল মাটিতে আঁকিবুঁকি করছে। সে লিখল সতেরো।

শহিদুল বলল, কিরে বাবুল তুই আঁকিবুঁকি করতে গিয়ে আজকের তারিখ লিখলি কেন?

বাবুল বলল, হাতে চলে এলো তাই।

চা খেতে খেতে বায়োজিত ভাই বলল, আজ রাতে তোমরা অপারেশনে বেরুবে, এসো তোমাদেরকে নিয়ে আরেকবার বসি।

আমরা বায়োজিত ভাইয়ের কাছে গিয়ে বসলাম। সে মাটিতে দাগ কেটে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, পরিকল্পনা মাফিক এগুতে হবে। হইচই করা যাবে না। ধরা পড়লেও এই আস্তানার কথা কাউকে বলা যাবে না।

বাবুল বলল, আমরা কখনো আপনাদের কথা বলব না।

বায়োজিত ভাই মৃদু হেসে বিদায় নিলো।

রাত গভীর। বাবুল-শহিদুল আর আমি, আমরা তিনজন কিশোর ঢাকা ক্লাবের দিকে হেঁটে চলেছি। বেতার কেন্দ্রের উঁচু প্রাচীরের তার কেটে বেতার কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি। মিলিটারিদের এখন বিশ্রামের সময়, তারা বিশ্রাম নিচ্ছে।

হঠাৎ দূর থেকে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ শোনা গেল। পরিস্থিতি ভয়াবহ দেখে আমরা নিজেকে গুছিয়ে নিলাম। অস্ত্র হাতে আড়াল হলাম। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। একসময় মিলিটারিরা রুম থেকে বেরিয়ে এলো। পরিস্থিতি অত্যন্ত বেগতিক ও ভয়াবহ, পালাবার পথ নেই। ক্রলিং করে কিছু দূর এগিয়ে গেলাম। একজন কমান্ডো বারান্দায় এসে চিৎকার করে

বলল, যাও লাইট লে-আও।

তাকে লক্ষ্য করে ঝোঁপের আড়াল থেকে গুলি ছুড়লাম। মিলিটারি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শুরু হলো গুলি বিনিময়। শহিদুলের গায়ে গুলি লাগল। সে 'জয় বাংলা'– চিৎকার করে আমাদের জানান দিলো। দুজন সিপাই তার দেহটি টেনেহেঁচড়ে বারান্দা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ঝোঁপের আড়াল থেকে গুলি ছুড়লাম। ওদের একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আবারও গুলি বিনিময়ের পালা। পাখির ডাক দিলাম, বাবুল কোনো জবাব দিলো না। ঘাড়কাত করে ডানদিকে তাকালাম। চাঁদের আবছা আলোয় বাবুলকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হঠাৎ দেখি সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। বুকটা ব্যথায় কুকড়ে এলো। ধীরে ধীরে পিছু হাঁটলাম। উঁচু প্রাচীর টপকিয়ে ঢাকা ক্লাবের মাঠে লাফিয়ে পড়লাম। মস্ত বড়ো এক গাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম।

দূরে কাটাতাঁরের বেড়ায় আলোকরশ্মি জ্বলে উঠল। মিলিটারিরা বেড়া টপকিয়ে ক্লাবের মাঠে নামতে শুরু করেছে। ভয়ে বুক চিন চিন করে উঠল। মুখ শুকিয়ে কাঠ। জিভ দিয়ে বার কতেক ঠোঁট ভিজিয়ে নিলাম। ওদেরকে কালো ছায়ার মতো, ভূতের মতো দেখাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে খোদাকে ডাকতে লাগলাম। গুটি শুটি হয়ে গাছতলায় বসে রইলাম।

'ওঠ সালে'– কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি একঝাঁক টর্চের আলো আমার চোখে-মুখে। গোবেচারার মতো ওদের দিকে তাকালাম। দেখতে ইয়া লম্বা, ধবধবে সাদা গায়ের রং, কালো কুচকুচে চুল, বাঁকানো মোচ, কলার ছড়ার মতো হাতের আঙুল। হাত দুখানা হাঁটু অবাধি এসে ঠেকেছে। একজন মিলিটারি খপ করে আমার ঘাড় চেপে ধরল এবং আমাকে মাটিতে নিক্ষেপ করল। বলল, লে যাও সা-লে-কো।

সিপাই আমাকে নিয়ে সামনের দিকে হেঁটে গেল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলেছি। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি টেবিল পাতা আছে। একজন মিলিটারি টেবিলের উপর পা তুলে চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিল। টেবিলে খান কতেক মদের বোতল।

– সালাম স্যার। সিপাইয়ের ডাকে মিলিটারি বজ্রের দৃষ্টি ছড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। হাত ইশারায় সিপাইকে চলে যেতে বলল। আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে একটু নড়েচড়ে বসল, ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল, তুম কোন হো?

বললাম, আবুল হোসেন।

– মুক্তিকো সাথ কাম কারতা?

না সূচক মাথা নাড়লাম।

– কিয়া তুম মুক্তি নেহি হো?

না সূচক মাথা নাড়লাম।

– তুমহারা ক্যাম্প কিধার হায়?

আবারও না সূচক মাথা নাড়লাম।

মিলিটারি রাগি কণ্ঠে বলল, কিয়া তুম হামারা বাত নেহি সামাঝতে?

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। সে বলল, আভি সাচবাত বোল, তো তুম কোন হো?

– বল বয়। (বল কুড়িয়ে আনার ছেলে)।

– বল বয়? তারপর সে উচ্চস্বরে বলল, দারোয়ান কাহা হায়, উসিকো বোলাও।

কিছুক্ষণ পর দুজন লোক সালাম দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। অবাঙালি। স্বাস্থ্যবান, কালো কুচকুচে গায়ের রং, ইয়া বড়ো গোঁফ। মিলিটারি ভারি গলায় বলল, দ্যাখো, ই লাড়কাকো পেহচানতে?

দারোয়ান দুজন না সূচক মাথা নাড়ল।

মিলিটারি চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, কুত্তাকা বাচ্চা, তুম হামকো ঝুট বোলা। সাচবাত বোল, – কৌন হে তু?

– 'কুকুরের বাচ্চা' গালি শুনে আমার শরীর রাগে রি রি করে উঠল। নিজেকে সংযত করে মাথা নোয়ালাম। চোখের নীচে ভয়ার্ত শূন্যতা অনুভূত হলো। মিলিটারি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আমার গলা চেপে ধরল। লাথি-গুঁতা চড়-থাপ্পর কিছুই বাকি রইল না। ছিটকে মাটিতে পড়লাম।

যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের হোস্টেলে। দিনের আলো ঘরে এসে ঢুকেছে। এটি হানাদারবাহিনীর অন্যতম নির্যাতন কেন্দ্র। একজন সিপাই কাছে এলো। দড়ি দিয়ে আমার হাত বেঁধে ফেলল। আমাকে টানতে টানতে ভেতর ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের এককোণে একটি টেবিল পাতা আছে, একজন মিলিটারি চেয়ারে বসে আছে। সে হাত ইশারায় আমাকে বসতে বলল। সামনের টুলে এসে বসলাম। আমাকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, হাম তুমকো জো জো বাত বাতায়েগা, সাচ বোলেগা। আভি বোল, আর ইউ মুসলিম?

– ইয়েস আই অ্যাম মুসলিম।

– গুড, ভেরি গুড। তুম তো মুক্তি হো?

– নেহি, হাম মুক্তি নেহি। আই অ্যাম 'বল বয়'।

– ঠিক হায় তুমারা বাত হাম সামাঝ লিয়া। ইয়েসটারডে রাত দো বাজে তুম মাঠ মে থা। ইয়ে বাত তো সাচ হায়?

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

– তুম রাত দো বাজে মাঠমে গিয়া কিস লিয়ে? উসিপার দো মুক্তি থা, জিসকো হামলোক গোলিমারা। আভভি বাতাও রাত দো বাজে কৌন সালে, বল লেনে তুমকো উধার ভেজা?

কঠিন জায়গায় আঘাত করেছে, –ভেবে চুপ করে রইলাম।

– ঠিক হায় আভি বোল তুমহারা মাকান কিধার?

একটু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, রেললাইনকো উধার হামারা মাকান থা। বস্তিমে তুমলোক আগ জ্বালা দিয়া।

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে বলল, অর তুম মুক্তি কা পাস গিয়া, উনি লোক তুমকো শেলটার দিয়া। বাত ঠিক হায় তো?

চুপ করে রইলাম। সে আমাকে চড়-থাপ্পর মারল। শুরু হলো নির্যাতন। অমানুষিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে টর্চার সেলে আমার দিন কাটতে লাগল। ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। প্রতিদিন রাতে ত্রিপল ঢাকা একটি লরি এখানে আসে। একদল যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ,

কিশোর ত্রিপলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, সবার হাত শক্ত করে বাঁধা। এখানে নির্যাতন চলে। ওদের কান্নায় বাতাস ভারি হয়ে উঠে।

গভীর রাত। চারদিক শুনশান নিরবতা। মিলিটারিরা মদ খেয়ে ঝিমুচ্ছে। নির্যাতন সেল এখন বেশ শান্ত। আমার চোখে ঘুম নেই। আমার দুহাত শিকলে বাঁধা। পালাবার পথ নেই। একজন অ্যাপ্রোন পরিহিত যুবক ঘরে ঢুকল। সাথে একজন অবাঙালি সিপাই। যুবকটির দিকে তাকালাম। আমার হাতের বাঁধন খুলে দিলো। সিপাই আমার ডান হাত শক্ত করে চেপে ধরল। যুবকটি আমার হাতে ইনজেকশনের সুচ পুশ করল। সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরের রক্ত টনে বের করে একটি পলি ব্যগে রাখতে শুরু করল। সারা শরীর ঝিমঝিম করছে। বিরবির করে বললাম, তুমি এক ভাই হয়ে আরেক ভাইয়ের শরীর থেকে রক্ত নিচ্ছ, লজ্জা করে না তোমার।

যুবকটি চোখ ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিলো। সিপাইকে বলল, তুম আভি বাহার যাও। হামারা অওর বি কুচ কাম হায়।

সিপাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যুবকটি ফিসফিস করে বলল, সরি ভাই। আমাকে হাসপাতাল থেকে তুলে আনা হয়েছে। ওদের কথা মতো কাজ না করলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। তবে আমি তোমার শরীর থেকে সব রক্ত নিব না। কিছুদিনের জন্য হলেও তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। তো এক কাজ করতে পারো, যদি সুযোগ হয় তাহলে কাউকে দিয়ে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার গাজী আবদুল হক স্যারের কাছে খবর দিও। স্যার গোপনে কিছু কাজ করছেন।

মৃদু হেসে যুবকটির দিকে তাকালাম। অমানুষিক অত্যাচার, এত নির্যাতনের পরও কেন জানি আমার দেহমনে সুখের পরশ বয়ে গেল। দুচোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি যেন মন্দিরের ঘণ্টা। যখন তখন ওরা আমাকে লাথি-গুতা মারছে, আমার দেহ থেকে সব রক্ত নেবার পর আমার মাথার চুল আপনা থেকেই ঝরে পড়তে লাগল, শরীরের চামড়া উঠে যেতে শুরু করল, দেহ কুকড়ে যেতে লাগল। বাথরুমে যাব সে শক্তিও হারিয়ে ফেললাম। ঘরে বসে মলমূত্র ত্যাগ করছি। দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন ওরা আমাকে রাস্তায় ফেলে দিলো।

ডিসেম্বর মাস। প্রচণ্ড শীত। ঠকঠক করে কাঁপছি। মিলিটারিরা আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় শাহাবাগ, পাবলিক লাইব্রেরি রাস্তার সামনে ফেলে দিয়ে গেল। অসাড় দেহ, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। তারপরও আমি হাসছি, এই ভেবে যে, শাহাবাগের ফুটপাতে শুয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারছি, মুক্ত আকাশ দেখতে পাচ্ছি। পথচারীরা আমাকে ফকির ভেবে কখনও-সখনও একটা রুটি ছুড়ে দেয়। খেয়ে না খেয়ে আমার দিন কাটে। আমার বাকশক্তি ধীরে ধীরে আড়ষ্ঠ হয়ে আসতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা। একজন জটাধারী ফকির এপথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তার ঝুলি থেকে আমাকে একটুকরা রুটি দিলো। বললাম, আমার একটা কাজ করে দিবে ভাই। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডাক্তার গাজী আবদুল হকের কাছে আমার খবরটা পৌঁছে দিবে।

ফকিরটি কোনো কথা না বলে সামনের দিকে হেঁটে গেল। সারারাত জেগে রইলাম। একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মানচিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুব সকালে হরিজন গোছের একজন লোক ময়লা ফেলার গাড়ি ঠেলে আমার সামনে এলো। আমার দিকে তাকালো। কঙ্কালসার দেহ, কোটারাগত চোখ, মাথায় চুল নেই, গায়ের চামড়া আপনা থেকে উঠে আসছে। পিটপিট করে তার দিকে তাকালাম। সে বলল, তুমি কে আছ বাবা?

বললাম, মুক্তি।

– তো ঠিক হায়, স্যার হামকো ইহা পারমে ভেজা বলে সে আমার দেহটিকে আলতোভাবে কোলে তুলে তার ময়লা ফেলার গাড়িতে রাখল। গাছের লতাপাতা কুড়িয়ে আমার সারা শরীর ঢেকে দিলো। দক্ষিণ দিকের বাক পেরিয়ে ময়লা ফেলার গাড়ি ঠেলে আমাকে সাথে নিয়ে সোজা হেঁটে চলেছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। হাসপাতালের পেছনে টিন শেড ঘর, লম্বা বারান্দা। ঘরে বেওয়ারিশ লাশ রাখা হয়। হরিজন বারান্দায় তার গাড়িটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটুপর দুজন অ্যাপ্রোন পরিহিত ডাক্তার লাশ কাটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হরিজন বলল, গাজীসাব কাহা পারমে হায় বাবু?

ওদের মধ্যে থেকে একজন বলল, উনাকে কী দরকার?

হাত জোড় করে হরিজন বলল, একটা লাশ আছে বাবু। জ্যন্ত লাশ আছে বলে সে আমার শরীরের উপর থেকে লতাপাতা সরিয়ে দিলো।

ওরা দুজন আমাকে দেখল এবং সামনের দিকে হেঁটে গেল। একটু পর ট্রলি নিয়ে ওয়ার্ডবয় এলো। আমাকে ওয়ার্ডে নিয়ে বেডে শুইয়ে দিলো। আমার হাত-মুখ ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিলো।

একদল ডাক্তারসহ প্রফেসর গাজী আবদুল হক সাহেব এলেন। থ্যাটিসকোপ বুকে দিতেই আমি ব্যথায় কেঁদে উঠলাম। ডাক্তার সাহেব বলল, তুমি কাঁদছ কেন?

– ব্যথা করছে। মিলিটারিরা আমার বুকে পাথর চাপা দিয়েছিল।

– তোমার নাম কী?

– আমি আবুল হোসেন।

সবাই চুপ। কারও মুখে কোনো কথা নেই। গাজী আবদুল হক স্যার স্বস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, আবুল, তুমি ভয় পেও না। তুমি বাঁচবে, নিশ্চয় আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে তুলব। তুমি হলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক, এদেশের সোনার টুকরা ছেলে, তুমি ব্যক্তি নও, সংকল্পের প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক। তুমিই বাংলাদেশ।

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

একাত্তরে বাংলাদেশ

সোহরাব পাশা

বাতাসে উদ্বাস্তু দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ তীব্র মেঘের ভিতর নুয়ে পড়ে
সমূহ সুন্দর,

মুখর সবুজ বাড়িগুলি
স্বপ্নময় ঘরগুলি
নিজস্ব থাকে না
রাত্রির স্বপ্নগুলি ভোর দেখে না ভোরে
পথের ওপরে। শিকড়ে আগুন ধরে
সববৃক্ষ-উদ্যানে। পা থেকে সরে যায় গন্তব্য,

অগ্নিজলে বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ
কাঁদে
মুমূর্ষু জীবন খোঁজে
নিজস্ব নিবিড় আলোকিত মানুষের
মুখ। অন্যদিন অন্ধবন্ধ তালা খুলতেই স্নিগ্ধ
রোদ। বসন্তের তীব্র হাওয়া
পথগুলি বাড়ি ফিরে আসে।

বিজয় দিবস বাংলাদেশের

আ. শ. ম. বাবর আলী

বিজয় দিবস বাংলাদেশের ডিসেম্বরের ষোলো,
নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে এদেশ স্বাধীন হলো।
মার্চ মাসেতে যুদ্ধ শুরু ডিসেম্বরে শেষ,
স্বাধীনতায় পূর্ণ হলো আমার বাংলাদেশ।

এদেশ এখন আমাদেরই– বিদেশিদের নয়,
ব্যবহারে দিতে হবে তার যে পরিচয়।
স্বাধীন জাতির পরিচয়ে সবার প্রয়োজন,
সব মানুষের প্রতি সবার সুন্দর আচরণ।

স্বাধীন জাতির অনেক বেশি দায়িত্ব যে আছে,
স্বাধীনতা অনেক কিছু চায় যে তাহার কাছে।
দেশটা স্বাধীন হলেই কিন্তু জাতি স্বাধীন হয় না,
দায়িত্বহীন জাতিরে কেউ স্বাধীন জাতি কয় না।

দায়িত্বহীন আমরা তো নই– কাজে প্রমাণ দেব,
বিজয় দিবস সামনে রেখে শপথ যে তার নেব।
অনুষ্ঠানের দিন নয়তো ষোলোই ডিসেম্বর,
ভালোবাসার দিন যে এটা ভুলে আপন-পর।

মুক্তিনায়ক শুধু একজনই

ফারুক নওয়াজ

যখন মুজিব মুজিব হয়নি; টুঙ্গিপাড়ার খোকা...
তখনই সে বোঝে বেনিয়া ব্রিটিশ জাতিকে দিচ্ছে ধোঁকা।
গাঁয়ের তরুণ কিশোর যুবক ধর্ম নির্বিশেষে...
'মিয়াভাই' বলে তাঁর আহ্বানে দাঁড়ালো পেছনে এসে।

বিদ্যালয়ের ছাদ চুঁয়ে পানি চুইচুই করে ঝরে ...
খোকাই প্রথম মন্ত্রীর কাছে সারানোর দাবি করে।
দিনে-দিনে খোকা আরও বড়ো হয়ে সামনে এগিয়ে যায়;
কলকাতা গিয়ে কলেজে ঢুকেই নেতার আসন পায়।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে খোকা জীবন তুচ্ছ করে ...
বিপদাপন্ন নগরবাসীকে পৌঁছিয়ে দেয় ঘরে।

সেই খোকা এই শেখ মুজিবুর; আটচল্লিশ সালে
বুঝে গেল দেশ আবার জড়ালো পাকিস্তানের জালে।
ছাত্র মুজিব পড়েন ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে,
প্রতিবাদী হন বঞ্চিত যত কর্মচারীর হয়ে।
বহিষ্কৃত হলেন তবুও মুচলেকা দেন নাই ...
সংকটকালে মুজিবুর ছাড়া আর কাকে বলো পাই?

সেই থেকে হলো পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই শুরু;
মুজিবই ভরসা; বাকিদের বুক কেঁপেছিল দুরুদুরু।
ভাষার প্রশ্নে জিন্নার প্রতি ঘিন্না জানান তিনি,
শোষকের বুকে তখনই বেজেছে শঙ্কার রিনিঝিনি।
তখনই তাদের লক্ষ্য মুজিব, মুজিবেই যত ভয় ...
সেই ভেবে তাঁকে কারাগারে নিলো; তরপরও সংশয়।
কারাগারে থেকে তাঁর নির্দেশে সংগ্রাম চলে দেশে,
প্রকৃত নেতার আসনে বসালো জাতি তাঁকে ভালোবেসে।

ভাষার লড়াইয়ে শেখ মুজিবুর, বাষট্টিতেও তিনি
ছেষট্টিতেই ছয় দফা পেয়ে দেশ হলো সাহসিনী।
উনসত্তরে মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু সবার ...
সত্তরে আর বাকি রইলো না সর্বশ্রেষ্ঠ হবার।

দুঃখী জাতির দুঃখ ঘোচাতে, জাগাতে স্বপ্ন চোখে...
বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ ছিল কি বঙ্গলোকে?

এই মুজিবুর সেই মুজিবুর– খোকা সে টুঙ্গিপাড়ার
এই মুজিবুর আলোর দিশারি পরাধীন পথহারার।
এই মুজিবুর মিছিলে মঞ্চে রাজপথে সারা দেশে...
ফাঁসির কাষ্ঠ দেখেও হেসেছে দেশটাকে ভালোবেসে।
জেলেই কেটেছে চৌদ্দ বছর, বাকিটা জীবন পথে
বন্দি জাতিকে স্বাধীনতা দিতে চেপেছে মৃত্যুরথে।

এই মুজিবুরই সাত মার্চের জাগ্রত জনতার...
এই মুজিবুরই মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ঘোষণার।
আর কেউ নয়– শুধু তাঁর ডাকে, শুধু তাঁর নির্দেশে
বাঙালি লড়েছে, জীবন দিয়েছে, ফিরেছে বীরের বেশে।
যোদ্ধা বাঙালি 'জয়-জয়-জয় বঙ্গবন্ধু' বলে...
স্লোগান তুলেছে বিজয় অহমে ভয়াল রণস্থলে।

আজ কোন বোকা, কোন সে আঁতেল, কোন দালালের ভাই...
বলে সে, একক নেতৃত্বেই স্বাধীনতা আসে নাই।
শোনো পাঁতিরাম– যাঁর ডাকে জাতি পণ করে লড়বার;
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা সেইজনই– একক সত্তা তাঁর।
তাঁরই ডাকে শুধু প্রাণ বাজি রেখে জাতি আনে স্বাধীনতা...
নেতৃত্বের ইতিহাসে শুধু লেখা থাকে তারই কথা।

বাঙালি জাতির হাজার যুগের স্বপ্নের ইতিহাসে;
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই নামই শুধু আসে।

বীর কাহিনি

শাফিকুর রাহী

বীর বাঙালির বিজয় নিশান বীরের গর্বগাথায়,
মেঘলাকাশে সূর্য হাসে বিপুল সম্ভাবনায়।
লক্ষ প্রাণের আত্মদানে জমিনে আসমানে,
রক্তবানে শোকাশ্রুতে অনন্ত উত্থানে
জয় বাংলার জয়োল্লাসে বইলো সুরের ধারা
সন্তানহারা বিরহিণীর হৃদয় পাগলপারা।

উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বরে
প্রাণের দোলায় উঠল নেচে সবারই অন্তরে।
বধ্যভূমির মাটি চাপায় লাশের উপর লাশে;
স্বজনহারার ব্যথা ভুলে আনন্দে মন হাসে।
আকাশ-বাতাস জানায় সালাম লক্ষ শহিদানে,
বিশ্ববিবেক বিস্মিত হয় বীরের জীবনদানে।

বুকের মানিক হারার শোকে মা-বোনের বিলাপে
চারদিকে কী হাহাকার; বুকভাঙা সন্তাপে !
এ বাংলায় সে গণহত্যার নির্মম নিদান কালে
কোটি মানুষ শরণার্থী ভারতের চাতালে–
গ্রামের পর গ্রাম জ্বালালো পাকিস্তানি দানো–
সেই যুদ্ধে শহিদ হলো ত্রিশ লক্ষ প্রাণও

বিজয় মানে নদীর ঢেউয়ে নৌকো সারি সারি,
মুক্ত হাওয়ায় জলপায়রা ফিরে আপন বাড়ি
বিজয় মানে বীর তারুণ্য সম্মুখ পানে ছুটবে;
আপনহারার দুঃখ ভুলে গোলাপ হয়ে ফুটবে।
বিজয় মানে আলোর নাচন করছে ঝিকিমিকি
শ্যামলিমা মায়ের বুকে পদ্মফোটা দিঘি।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ধরে গণহত্যার কালে
বাতাস এসে থমকে দাঁড়ায় নায়ের বৈঠা পালে।
স্বাধীনতার লড়াই শুরু– সুদীর্ঘ সংগ্রামে
কৃষক-শ্রমিক বীর তারুণ্য বিজয়ের উদ্দামে–
পিতার কণ্ঠে গর্জে ওঠে স্বাধীনতা আনতে
বীর গেরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে দূর পাহাড়ের প্রান্তে।

পুব আকাশে রক্তরঙিন ভোরের সূর্য হাসে
দীর্ঘকালের ভাঙলো আঁধার এই ডিসেম্বর মাসে।

ভূখণ্ড

শেখ সালাহ্উদ্দীন

জনক হঠাৎ একাত্তরে
নিরুদ্দেশ; ফসলের মায়া ত্যাগ করে
লাঙল-জোয়াল ফেলে কড়ে-পড়া হাতে
তুলেছেন থ্রি-নট-থ্রি কোন্ প্রেরণাতে?

রুগ্ন মাকে কিশোর অগ্রজ কাঁধে বয়ে
পেরিয়েছে শত মাইল অনন্যোপায় হয়ে
মেলে যদি একটু আশ্রয়
নেই রক্তচক্ষু; মৃত্যুভয়

বোনের মেহেদি-মাখা হাত
এভাবেই হয়েছে ইস্পাত
তুলেছে গ্রেনেড স্টেনগান
তুচ্ছ-মৃত্যুর নিশ্চিত আহ্বান

আমি পিতা-ভাই-বোনের রক্তের দামে
পেলাম ভূখণ্ড; বাংলাদেশ নামে।

আনন্দ বাঙালি জাতির

রুস্তম আলী

রক্তে লেখা বিজয়ের হাসি
কোটি কোটি প্রাণে বাজে বিজয়ের বাঁশি।
সম্ভ্রমহারা মায়ের আকুতি
মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কীর্তি।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে
ষোলো ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল
মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে
পাকিস্তানের হায়েনার দল।

দেশব্যাপী স্লোগানে মুখরিত
নজরুলের গান–
এদেশ তোরা ছাড়বি কিনা বল
এদেশ তোরা ছাড়বি কিনা বল
নইলে কিলের চোটে
হাড় করবো জল।

অবশেষে বিজয়ের হাসি হাসলাম আমরা
ধ্বংস হলো হায়েনার দল।

আকাশে-বাতাসে বিজয়ের গন্ধ
আহা! কী আনন্দ, আহা! কী আনন্দ।

বিজয় আমার ঘরে

বাবুল তালুকদার

বিজয় এলো আমার ঘরে
রক্তমাখা জামা পরে,
দেশের জন্য অস্ত্র ধরে
শত্রুরা সব পালিয়ে সরে।

দেশের মাটি রক্ষা করে
কত প্রাণ গেল ঝরে,
মায়ের চোখে আজও পানি
আমরা আজও ঘানি টানি।

বাংলা আমার দেশের মাটি
সোনার চেয়েও খাঁটি
বিজয় আনি, স্বাধীন করি গণতন্ত্রের দেশ গড়ি
বাংলা আমার মাতৃভূমি বর্ণমালা মুখে পড়ি।

এই মাটিতে জন্ম আমার এই মাটিতে থাকি
সবুজ-শ্যামল বাংলা আমার যত্ন করে রাখি
ষড়ঋতুর দেশ আমার রংধনুতে ভরা
ফুল ও ফলের বাংলা আমার রংধনুতে করা।

বিজয়ের দেশ বাংলা আমার স্বাধীনভাবে থাকি
রক্ত রাঙা বাংলা আমার রংধনুতে রাখি
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল বাংলা বর্ণমালা
বাংলা ভাষায় কথা বলি রইল না আর জ্বালা।

আমরা স্বাধীন মুক্ত এদেশ, বিজয় আমার ঘর
বাঙালি মানুষ আমরা সবাই কেউ আপন পর
বিজয় এনে সুখ-শান্তি ছড়িয়ে দিলো দেশে
বাঙালি মানুষ মিলেমিশে থাকছি ভালোবেসে।

বিজয় পতাকা

মোল্লা আলিম

বিজয় পতাকা উড়ে এখন বাংলাদেশে
বহু রক্ত ত্যাগের পরে একাত্তরে আসে
ষোলোই ডিসেম্বরে হলো চির অবসান
নয়টি মাস যুদ্ধে গেল কত তাজা প্রাণ।

মা-বাবা ছেলেহারা হলো নিঃসন্তান
এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসের খেলা খেলে পাকিস্তান
সম্ভ্রমহারা নারীদের কত আর্তনাদ
কেউ ছিল না অত্যাচারীর করতে প্রতিবাদ।

আগুন জ্বালায় পোড়ায় ঘর বিনষ্ট সম্পদ
হয়নি পূরণ পায়নি শেষে হারায় মসনদ
লজ্জিত হলো শেষে দেশে জমায় পাড়ি
অমানবিক পশুতুল্য এসব অত্যাচারী।

মুজিব এলো দেশে ফিরে পেল তাঁর সম্মান
তিনি বাংলার স্থপতি সে চির মহান
জয় বাংলার উঠল ধ্বনি জয় বাংলার জয়
ধন্য হলো বাংলাদেশ নেই তো কোনো ভয়।

স্পন্দন তুমিই তো

রীনা তালুকদার

তরঙ্গায়িত ইথারে সেই ডাক
যেখানে অবহেলা সেখানেই আছো
আজ কেমন বেসাতি চলে তোমার নামে
মানতে পারি না তবু মানতে হয়
দেখতে হয় অস্বস্তি জোড়া চোখে।

বাক্যগুলো যখন হরতাল ডাকে
তখনই তুমি শব্দ হয়ে যাও
সৌরশক্তি; আড়াল থেকে
সেই শব্দধ্বনি যখন ধ্বনিত হয়
নত হয়ে যায় বাঙালির অস্তিত্ব
সোনার বাংলার স্পন্দন তুমিই তো।

রক্তের সাগরে

নীহার মোশারফ

কত রাত গেছে বিষণ্ন ঝড়ে
নির্ঘুমে কেটেছে প্রিয়ার দুচোখ।
পথের কাঁটায় ভাঙা ভাঙা হাঁটা
তল্পিতল্পা নিয়ে কতজন চলে গেছে
পাশের দেশে।
তবুও ওরা বুঝতে চায়নি এই আমাদের
রক্তের সাগরে সাঁতরে সাঁতরে
ডুবে গেছে পরান পাখি।
আঁখি তার ছলছল জানালার ধারে
একদিন বিজয় এসেছে আমাদের দোরে
হেসেছে শাপলার বিল
নেতা ছিলেন আমাদের বীরত্বের মাঝে।

সোনার হরফে লেখা নাম স্বাধীনতা

খোরশেদ আলম নয়ন

স্বাধীনতা মায়ের আসমানি রং শাড়ি
নিকান উঠোন–ধানের ভাপসা ঘ্রাণ,
স্বাধীনতা প্রিয় সোলেমানি তরবারি
এ মাটির বুকে শায়িত লক্ষ প্রাণ।

স্বাধীনতা সে তো চির যাযাবর পাখি
পদ্মার বুকে নিঃসীম বালুচর,
স্বাধীনতা গাঢ় আঁধারে নীল জোনাকি
স্বাধীনতা প্রিয় শৈশব-খেলাঘর।

সোনার হরফে লেখা নাম স্বাধীনতা
স্বাধীনতা নয় কারও করুণার দান,
স্বাধীনতা বীর বাঙালির ইতিকথা
প্রিয় স্বাধীনতা রবে চির অম্লান।

আনন্দেরই বিজয় নিশান

শাহীনুর রহমান রিয়াদ

দেশের জন্য জীবন দিলো বীর বাঙালি বীরে
বসতহারা কোটি মানুষ উদ্বাস্তু শিবিরে।
বিজয় সুখে-একাত্তরে মধ্য ডিসেম্বরে;
উঠল হেসে প্রকৃতিও দূরের তেপান্তরে।

আনন্দেরই বিজয় নিশান জানান দেয় বাতাসে–
মেঘলাকাশে চন্দ্র হাসে সুদূর নীল আকাশে।
জাতির পিতা পাকিস্তানের বন্দি কারাগারে;
বিশ্ববাসী আওয়াজ তোলে ভয়াল অন্ধকারে।

দেশপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দিতে হবে
প্রতিবাদে নগরবাসী জ্বলে উঠল সবে।
বঙ্গবন্ধু ফিরবে দেশে সুখবরটা আসে
মুক্তভূমি উঠল হেসে বিজয়ের উল্লাসে।

নয় মাসেরই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দিনের শেষে–
বীরের প্রত্যাবর্তন কালে স্বদেশ ওঠে হেসে।
আবেগরুদ্ধ স্বজনহারার দুঃখ ভোলার গানে–
জাতির পিতার কণ্ঠ বাজে রমনারই উদ্যানে।

বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধের মহানায়কের নাম

বি. এম. লিটন মাহ্‌মুদ

বঙ্গবন্ধু একটি দেশের নাম।
বঙ্গবন্ধু ১৩ শত নদীর নাম।

বঙ্গবন্ধু একটি সাগরের নাম ।
বঙ্গবন্ধু ৬৮ হাজার গ্রামবাংলার জনপদের নাম।

বঙ্গবন্ধু একটি মানচিত্রের নাম।
বঙ্গবন্ধু একটি ভাষা অধিকার আদায়ের নাম।

বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধিকার আন্দোলনের নাম।
বঙ্গবন্ধু একটি সঠিক ইতিহাসের নাম।

বঙ্গবন্ধু পথশিশুর ঠিকানার নাম।
বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধের মহানায়কের নাম।
বঙ্গবন্ধু একটি পড়ন্ত বিকেলের লাল ডগডগে সূর্যের
নদীর স্রোতের ধারার নাম।

বঙ্গবন্ধু একটি পাহাড়ের ঝরনার নাম।
বঙ্গবন্ধু একটি অধিকার আদায়ের নাম।

বঙ্গবন্ধু একটি সাম্যবাদের নাম।
বঙ্গবন্ধু একটি সবুজ বৃত্তে লাল গোলাকার পতাকার নাম।

বিজয়ী মুক্তিসেনা

আলমগীর কবির

মেঘের মতো আঁধার ঘেরা রাত্রি ছিল,
অকুতোভয় বীর সেনারা সাথি ছিল।
হানাদারের সঙ্গে তখন যুদ্ধ ছিল
স্বপ্ন মাখা আলোর সকাল রুদ্ধ ছিল।

ক্যাম্পের সে এক কঠিন জীবনযাপন ছিল,
লাল-সবুজের প্রাণ পতাকা আপন ছিল।

মান বাঁচাতে জীবন-মরণ লড়াই ছিল
ক্ষয় করেছি তাদের যত বড়াই ছিল।

কত সাথি মুক্তিসেনা প্রাণ হারালো,
কত গোলাপ প্রতিরোধে ঘ্রাণ হারালো।

অবশেষে ফিরে এলাম নিশান হাতে,
ছিল গাঁয়ের বাউল-কবি-কৃষান সাথে।

বাবার মুখে স্বাধীনতার সুখ দেখেছি,
কান্না শেষে মায়ের হাসিমুখ দেখেছি।

বিজয়ের হাসি

আলম শামস

রক্তমাখা পথ মাড়িয়ে
তোমাকে ছুঁই স্বাধীনতা
স্বজন হারা মর্মকথা
আনন্দ-সুখ বিয়োগব্যথা।

খুন-হত্যা জেল জুলুমে
শৃঙ্খলিত বন্দি থেকে
রক্ত ভেজা তোমার ছবি
মানসপটে নিপুণ এঁকে।

দেশ জনতা অস্ত্র ধরি
সোনার বাংলা স্বাধীন করি।

আমাদের এই পতাকাটার
আজকে খুঁটি শক্ত,
এর জন্য বীর সেনারা
দিয়েছিল রক্ত।

বাংলা মায়ের বীর সেনারা
ভয় পায় না মোটে।
তাদের ত্যাগে সবার মুখে
বিজয়ের হাসি ফোটে।

বিজয়ের বাণী

জাহাঙ্গীর হোসাইন

বিজয়ের বাণী তুমি
অম্লান হাসি তুমি
ও আমার প্রিয় স্বাধীনতা।

তুমি যেন মুক্ত আকাশে
বিহঙ্গের উড়ে চলা
তুমি যেন বয়ে যাওয়া
সাদা মেঘের ভেলা
অবশেষে নিঃশেষ হলো পরাধীনতা
ও আমার প্রিয় স্বাধীনতা।

তুমি যেন বয়ে যাওয়া
নদীর স্রোতোধারা
তোমাকে পেয়ে সকল বাঙালি
খুশিতে আত্মহারা
যেমন খুশি তেমন মাতো
আজ নেই কোনো বাধ্যবাধকতা
ও আমার প্রিয় স্বাধীনতা।

শাশ্বত সুন্দর

খান চমন-ই-এলাহি

শাশ্বত সুন্দর তুমি
তোমার পদতলে গ্রাম ও তিলোত্তমা নগরীগুলো
ঝরনা, স্থাপত্য, বনায়ন, জাদুঘর, আলোকসজ্জা
কিছুই তোমার সমকক্ষ নয়!

এমনকি তুমি সামনে এলে
মূর্ত কিংবা বিমূর্ত রূপে
স্পর্শের ভেতরে কিংবা কল্পনায়
সবাক-নির্বাক আমি তোমাতেই নত হই।

আমি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র খুঁজি না
সমুদ্র-গিরি, শস্যের মাঠ, মরুময়তা
রোদ-বৃষ্টি, শোক-আনন্দ, দুঃখ-সুখ
এর কিছুই আমাকে ডাকতে পারে না।

আমি শুধু নির্বিঘ্নে তোমাকে চাই
প্রার্থনার মতো বিশ্বাসযোগ্য উপমায়
তুমি কি অন্ধকারে তোমার প্রেমময় হাত
বাড়াবে আমার দিকে ভালোবাসা বুকে?

বীর গেরিলা আওয়াজ তোলে

অরণ্যগুপ্ত

ধাবমান মেঘবলাকার জগৎ কাঁপানো গোলাপিত বিভায় বিকশিত
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের আত্মদান আর দুই লক্ষ ধর্ষিতার বুকভাঙা রোদনে।
কম্পমান তাবৎ গৃহলোক আচমকা আনন্দ নৃত্যে জেগে ওঠে গায়
কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের সুরেলা সংগীত। বীরের জীবন বিসর্জন– মা-বোনের সম্ভ্রম
পিতার দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসে ভয়ার্ত অমাবস্যার কালো চাদরে ঢাকা
আকাশের আঙ্গিনায় ভেসে ওঠে বিস্ময়ের উল্লাস ধ্বনিতে চন্দ্রিমা হাসি।

বর্গি হানাদারের গণহত্যার দানবীয় ত্রাসে বিরান প্রায় সমগ্র মানববসতি
বাকরুদ্ধ বাউল গায় স্বজনহারানোর বিলাপগাথা।
কৃষক তার লাঙল জোয়াল ফেলে শ্রমিক কারাখানার তালা বন্ধ করে
হাতে অস্ত্র-বুকে সাহসের উল্কা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে
গহীন অন্ধকারে জীবনের মায়াকে তুচ্ছজ্ঞান করে ত্যাগের মহিমায়
বিজয়ের স্বপ্ন আঁকে মুক্তির দারুণ কসরতে।
বিজয় মানে মুক্ত-আলো বাতাস পানে ধাবিত মন-প্রাণে বাজবে
সুরের বীণা। কলমি ডগায় নাচবে ডাহুক বাতাস বানে হাসবে–
বিজয়ী বীরের মনের সুখে গান কবিতার বসবে আসর।
অমন মহৎ স্বপ্নরঙিন আকাশতলে বীর গেরিলা আওয়াজ তোলে
হিম্মত হাকায় জয় বাংলার বিজয় নিশান দখিনা বাতাসে উড়ায়
বিজয় সংগীতের তালে তালে প্রকৃতিও অজানা আনন্দে নেচে ওঠে।

তিনটি কবিতা

জাফরুল আহসান

রাত জাগা চাঁদ
শব্দে ছন্দে একফালি চাঁদ উঁকি দিয়ে যায়
কবিতারা হাঁটে কবির উঠোনে ভরা জোছনায়;
জোছনার নদী জলে থইথই যেনো পটে আঁকা ছবি
তোমার বিরহে রাত জাগা চাঁদ ধরে রাখে কবি।

দুষ্টু ভ্রমর
প্রাঙ্গণে লেগেছে আগুন বিশ্বাসে
লেলিহান তার ফণাটি বাড়ায় নিশ্বাসে;
ঈর্ষার ঝড় তছনছ করে প্রিয় বাতিঘর
চারপাশ ঘিরে আছে লোভাতুর দুষ্টু ভ্রমর।

মেঘের পাহাড়
নীলাকাশ ছুঁয়ে মেঘের পালকি যাবে কতদূর
মেঘের পাহাড়-বন্ধুর পথ ছায়া রোদ্দুর;
সন্ধ্যামালতি কণ্ঠে ধরেছে বেহাগের সুর
মেঘবালিকার ঘুঙুর সেকি বৃষ্টি নূপুর।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ২২শে নভেম্বর ২০২৩ বঙ্গভবনে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

স্নাতকদের নিজ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের (এএফডব্লিউসি) স্নাতকদের ন্যায়বিচার ও জনগণের মুক্তির প্রচারের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ২২শে নভেম্বর বঙ্গভবনের দরবার হলে এনডিসি ও এএফডব্লিউ কোর্স ২০২৩-এর স্নাতকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি আশা করি, এনডিসি কোর্সের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করবে। কোর্সের সফল সমাপ্তির জন্য সব কোর্স সদস্যদের অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি। স্নাতকদের দেশের উন্নতির জন্য নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুবসমাজকে শিক্ষিত এবং দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেও পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপ্রধান।

বাংলাদেশ সর্বদা শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত কয়েক দশক ধরে দেশ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় চিত্তাকর্ষক অগ্রগতির মাধ্যমে উন্নয়নের এক অসাধারণ যাত্রা শুরু করেছে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং সশস্ত্রবাহিনী ওয়ার কোর্সের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যা বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সিনিয়র এবং মধ্যম সারির অফিসারদের জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন, নেতৃত্ব এবং নীতিনির্ধারণসহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ভাষণের শুরুতেই রাষ্ট্রপতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী শহিদ ও দেশের বীর সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পরে রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে এনডিসি স্নাতকদের সঙ্গে এক ফটোসেশনে অংশ নেন।

সংবিধানের বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুসরণের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের সদস্যদের তাদের দায়িত্ব পালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংবিধানের বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, আমি আশা করি জাতীয় সংবিধান দিবস পালনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ সংবিধানে বিধৃত তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংবিধানের বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করবে। ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনতার মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন' করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'খসড়া সংবিধান' বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। বিলের ওপর আলোচনা শেষে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর গণপরিষদের সদস্যগণ হাতে লিখিত সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষর করেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু দেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান উপহার দেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, সংবিধানে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়। সংবিধান একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ামক দলিল।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্ব কার্যকর হইবে। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।'

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর সুলিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের সবার পবিত্র কর্তব্য। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাই।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শহিদ নূর হোসেনসহ অনেকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গেছেন। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ১০ই নভেম্বর শহিদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে ৯ই নভেম্বর দেওয়া এক বাণীতে একথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১০ই নভেম্বর শহিদ নূর হোসেন দিবস। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। ১৯৮৭ সালের এ দিনে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সাহসী সৈনিক নূর হোসেন 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তিপাক' স্লোগান শরীরে ধারণ করে অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেদিন প্রতিবাদের পুরোভাগে থাকা শহিদ নূর হোসেনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। শহিদ নূর হোসেন দিবসে নূর হোসেনসহ গণতন্ত্রের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সব শহিদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন মোঃ সাহাবুদ্দিন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'আমরা কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করি'। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসনের। অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে শহিদ নূর হোসেনসহ আরও অনেকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গেছেন। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি নূর হোসেনসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদানকারী সবার আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ও ক্ষতির প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষা করতে ডায়াবেটিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে একথা বলেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১৪ই নভেম্বর 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ডায়াবেটিস স্বাস্থ্যের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সারাজীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি জটিলতা, অন্ধত্ব, মাড়ির রোগ এবং অঙ্গ বিচ্ছেদের মতো মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

মোঃ সাহাবুদ্দিন জানান, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই এ রোগের প্রকোপ বাড়ছে। তাই ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে হবে এবং ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য– 'ডায়াবেটিসের ঝুঁকি জানুন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন' যথার্থ হয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

প্রতিবেদন : মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের নাগরিক, করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় কর সেবা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের রাজস্ব ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ৩০শে নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। 'আমরা বদলে যাবো, আমরা বদলে দিবো'– স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩ পালিত হচ্ছে জেনে প্রধানমন্ত্রী আনন্দিত। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী দেশের সম্মানিত সকল করদাতা এবং আয়কর বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি যারা এ বছর সেরা করদাতা সম্মাননা পাচ্ছেন তাদের অভিনন্দন জানান।

ইতোমধ্যে নতুন আয়কর আইন ২০২৩ প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে জেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের সরকারের অন্যতম সাফল্য। দেশের মানুষ এখন স্ব-প্রণোদিত হয়ে আনন্দের সঙ্গে কর প্রদান করছে। এছাড়া এ বছরই আমরা প্রথমবারের মতো ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার সিস্টেম প্রবর্তন করেছি। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রান্তিক করদাতাগণ অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারছেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের সুবিধার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এ বছর প্রথমবারের মতো করশূন্য রিটার্ন দাখিলকারী করদাতাদের জন্য অনলাইনে এক পৃষ্ঠার রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রাপ্তি স্বীকার এবং সনদ দুটো পাওয়া যাবে।

সশস্ত্রবাহিনী জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সশস্ত্রবাহিনী আজ জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্রবাহিনী যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা এ দিনে সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতিবছর ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস পালন করা হয়।

সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাবেন এমন আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই নভেম্বর ২০২৩ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২য় জাতীয় কুষ্ঠ রোগ সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

দেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে কুষ্ঠমুক্ত করার অঙ্গীকার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করছি। ১২ই নভেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'দ্বিতীয় জাতীয় লেপরোসি (কুষ্ঠ রোগ) সম্মেলন ২০২৩'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। এসময় তিনি দেশে উন্নতমানের যে ওষুধ কোম্পানি রয়েছে তাদেরকে কুষ্ঠ রোগের ওষুধ উৎপাদনেরও আহ্বান জানান। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী অ্যাপ্রোচ টু জিরো লেপরোসি বাই ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করাসহ আরও সব রকম সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কুষ্ঠ রোগ শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর লেপরোসি ইন বাংলাদেশ ২০২২-২০৩০' প্রণয়ন এবং যথাযথভাবে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কুষ্ঠ রোগীদের সহানুভূতি ও সেবা যেমন দরকার, তাদের পাশে থাকাও দরকার। তাদের মনোবল সৃষ্টি করা দরকার এবং সকলে সেটাই করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এটা ছোঁয়াচে রোগ বলে পুরনো ভ্রান্ত ধারণা এক সময় যেটা ছিল সেটা থেকে সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সরকার প্রতিবন্ধী, কুষ্ঠ রোগী এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ও জীবন-জীবিকার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদের চাকরিতে পুনর্বাসন

করা হলে ব্যবসায়ীদের কর মুক্ত রেয়াত দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসময় তিনি সকল চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীসহ দেশের সকল নাগরিকদের কুষ্ঠ রোগীদের অবহেলা না করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান।

১৫৭টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন

২৪টি মন্ত্রণালয়ের ১৫৭টি প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী নির্মিত ১০ হাজার ৪১টি অবকাঠামোর সমন্বিত উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৪ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় ২৪টি মন্ত্রণালয়ের ১৫৭টি প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার ৬৪৪ অবকাঠামো উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ৫ হাজার ৩৯৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমিসহ ঘর প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে সম্প্রতি শেখ হাসিনা সরণি নামকরণ করা পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়েসহ ১৫টি প্রকল্প গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে সম্পন্ন হয়েছে এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৫তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয়, কক্সবাজারে ১০তলা বিশিষ্ট লিডারশিপ ট্রেনিং সেন্টার এবং চারটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি প্রায় এক হাজার ৯২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুই হাজার ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দরসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৫টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ৩রা ডিসেম্বর ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ন্যায় বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। দেশের প্রতিবন্ধী ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় থেরাপিউটিক সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৪৫টি ভ্রাম্যমাণ মোবাইল রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি ভ্যান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার পথ অবারিত করতে সারা দেশে ৭৪টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে ঢাকার মিরপুরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স (সুবর্ণ ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করতে প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলার সাভারে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস হয়েছে। এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য– 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন'।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

সাংবাদিকরা মানুষকে পথ দেখায়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ২৬শে নভেম্বর রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকরা মানুষকে পথ দেখায়, আলো দেখায়, সমাজকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে। জনগণ যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, সে জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। আজকে যে দেশটা বদলে গেছে, দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি হয়েছে, এটা যেন অব্যাহত থাকে। এসময় ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের মঙ্গল কামনা করে মন্ত্রী বলেন, সরকারি পেনশন স্কিমে সাংবাদিকদের জন্য যেন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে চাঁদা দেওয়া হয় এবং এটি যেন দশম ওয়েজ বোর্ডে আসে, সে বিষয়ে কাজ করছি, আপনাদেরও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কথা বলার অনুরোধ জানাব।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট সাংবাদিকদের একটি ভরসার স্থল

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ২৩শে নভেম্বর রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট নিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সাংবাদিকবান্ধব, এই ট্রাস্ট তার অনন্য দৃষ্টান্ত। আজ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট সাংবাদিকদের একটি ভরসার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনাকালে এককালীন সহায়তা হিসেবে ১০ হাজারের বেশি সাংবাদিককে ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ জন্য ১০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও অতিথিবৃন্দ এ দিন ১৮৬ জন সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের হাতে ১ কোটি ৫৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এর আগে তথ্য ভবন কমপ্লেক্সে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৩শে নভেম্বর ২০২৩ ঢাকায় তথ্য ভবনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন অফিস উদ্বোধন এবং আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

পুরাতন ডিএফপি ভবনের দ্বিতীয় তলায় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন অফিস উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানদ্বয়ে বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, মহাসচিব দীপ আজাদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. নিজামূল কবীর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া, ট্রাস্টের পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমাজের জন্য অনুসন্ধানী রিপোর্টিং প্রয়োজন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, মানুষ যে দিকে তাকায় না, সমাজ যেটি নিয়ে ভাবে না, দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি যে দিকে কাজ করে না, সে ক্ষেত্রে বিশেষ রিপোর্টিং দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি খুলে দেয় এবং সমাজকেও ভাবায়। এমন অনেক রিপোর্ট পত্রিকার পাতা এবং টেলিভিশনে প্রচারের ফলে সমাজের তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হয়। দেশ ও সমাজের জন্য এ ধরনের অনুসন্ধানী রিপোর্টিং খুবই দরকার। ১৯শে নভেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যারা এ রকম অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেন তাদের অনেক সময় অনেক হুমকির মুখে পড়তে হয়। সাংবাদিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমি যখন এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলাম না, তখনও রিপোর্টার্স ইউনিটির সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, ভবিষ্যতেও যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন আমি আপনাদের পাশে থাকব। আমার ছোটোবেলার অনেক বন্ধু সাংবাদিক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। আমি এই সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে জানি যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কত প্রতিবন্ধকতা এবং যারা সাংবাদিকতায় ঢোকে তারা অনেক মেধাবী। আমার যতটুকু সুযোগ এবং সামর্থ্য থাকবে সবসময় আপনাদের সাথে থাকব। অনুষ্ঠানে ১৯ ক্যাটাগরিতে ২০ জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়।

২০৪১ সালের মধ্যে দেশে শতকরা ৪০ ভাগ শক্তি আসবে সবুজ উৎস থেকে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত মুজিব ক্লাইমেট প্ল্যান অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের ৪০ শতাংশ শক্তি সবুজ উৎস থেকে আসবে। সবুজ উৎসের অন্যতম প্রধান দুটি হচ্ছে– সৌর ও পারমাণবিক শক্তি। দেশে সোলার বা সৌরশক্তি প্রসার লাভ করছে এবং আমরা নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক ক্লাবে যোগ দিয়েছি। ৬ই নভেম্বর সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্টস ফোরামের (বিসিজেএফ) সঙ্গে আরব আমিরাতের দুবাইয়ের অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৮-এ দেশের অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনাসভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পশ্চাৎপদতার কথা উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্যারিস চুক্তির বৈশ্বিক ঐক্যমত মোতাবেক আমরা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারছি না। একই সাথে প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে ৩ থেকে ৪ মিলিমিটার বৃদ্ধি পায়, আমাদের এই অংশসহ কোনো কোনো অংশে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। গত ৩০ বছরের এই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি যে, যেখানে বন্যা হতো না সেখানে বন্যা হচ্ছে। পাকিস্তানে বন্যার ভয়াবহতা কখনো ছিল না সেখানেও হচ্ছে। বরফ অঞ্চল সাইবেরিয়ায় বুশ-ফায়ার হচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রশমিত করতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক কর্মযজ্ঞের বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এটি প্রশমনের জন্য প্রথমত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং জনগণের সচেতনতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। পৃথিবীর জন্য দুঃখজনক হচ্ছে বিভিন্ন দেশের রাজনীতি অস্ত্রবাজদের খপ্পরে পড়েছে। ফলে বৈশ্বিক ক্লাইমেট ট্রাস্ট ফান্ডে কোনো অর্থ জমা পড়ছে না। কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য দেখা যাচ্ছে অর্থের কোনো অভাব হচ্ছে না। পৃথিবীকে বাঁচাতে এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে বাংলাদেশ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে নিট পোশাক রপ্তানিতে বৈশ্বিক জায়ান্ট চীনকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। প্রথমবারের মতো এই অর্জন করেছে দেশের পোশাক খাত। ইউরোপের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের আধিপত্য অর্জনের পরেই এলো উল্লেখযোগ্য এ অগ্রগতি।

ইইউ-এর আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাট জানিয়েছে, ২০২৩ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে ২৭ দেশের এই ব্লকে বাংলাদেশের নিট পোশাকের রপ্তানিমূল্য ছিল ৮৩১ কোটি ইউরো। একই সময়ে চীনের রপ্তানিমূল্য ছিল ৮২৭ কোটি ইউরো। অর্থাৎ সামান্য ব্যবধানে এগিয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছরে প্রথমবারের মতো বাজারটিতে নিটওয়্যার রপ্তানিতে প্রথম স্থান অর্জন করে বাংলাদেশ। এর প্রধান কারণ, চীন আর এখন লো-এন্ডের পোশাকপণ্য উৎপাদন করে না। অন্যদিকে বাংলাদেশ এই খাতে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলেছে।

সাগরের তলদেশ দিয়ে ডিজেল পরিবহণ

অবশেষে সাগরের তলদেশ দিয়ে ডিজেল পরিবহণ শুরু হয়েছে। সেখানে স্থাপিত পাইপলাইন দিয়েই ডিজেল পরিবহণ করা হচ্ছে। গভীর সমুদ্রের জাহাজ থেকে পাইপলাইনে মহেশখালী পৌঁছাবে জ্বালানি তেল। ৫ই ডিসেম্বর গভীর সাগরে অপেক্ষমাণ একটি বড়ো জাহাজ থেকে ডিজেল পাম্প করা শুরু হয়। এতে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি।

সাগরে ভাসমান এই মুরিং থেকে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের দুটি পাইপলাইনের মাধ্যমে মহেশখালীর স্টোরেজ ট্যাংক টার্মিনালে ডিজেল পরিবহণ শুরু হয়েছে। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপকূল থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার গভীর সাগরে স্থাপন করা হয়েছে এসপিএম। মূলত পরিশোধিত ডিজেল এবং ক্রুড অয়েল পরিবহণ করা হবে এই পাইপলাইন দিয়ে। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রকল্পটিতে রয়েছে ১১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দুটি পাইপলাইন। প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হলে প্রতিবছর প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে কর্মকর্তারা জানান।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে স্মার্ট উদ্যোগ 'সাথী'

নাগরিক সেবা প্রাপ্তি সহজ করতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং ডাক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে 'স্মার্ট সেবা' প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নাগরিক সেবা আরও সহজলভ্য ও জনবান্ধব করে তোলার পাশাপাশি ডিজিটাল ডিভাইড শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এসপায়ার-টু-ইনোভেট (এটুআই)-এর কারিগরি সহযোগিতায় ন্যাশনাল ব্রডব্যান্ড পলিসি বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ 'সাথী'তে মোবাইল এয়ারটাইমভিত্তিক সরকারি সেবার ফি পরিশোধ, স্মার্ট আর্টিক্যাল কালেকশন (চিঠি, ডকুমেন্ট, পার্সেল), স্মার্ট মোবাইল ডাকঘর এবং স্মার্ট পোস্ট বক্সের মতো স্মার্ট সেবার পাইলট কার্যক্রমও শুরু করা হবে। ১২ই ডিসেম্বর ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের দায়িত্ব পাওয়ার পর ৬ই ডিসেম্বর পৃথক এক সভায় স্মার্ট সেবা কার্যক্রমগুলো পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। একইসঙ্গে তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই'র সহায়তায় ইতিপূর্বে আয়োজিত 'স্মার্ট সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' থেকে উদ্ভূত সকল ধরনের স্মার্ট সেবা বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ 'সাথী' মূলত অ্যাপলের সিরি কিংবা আমাজনের অ্যালেক্সার'র মতোই একটি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ হিসেবে চালু করা হচ্ছে। স্মার্ট নাগরিকের জন্য স্মার্ট সংযোগ, এটা এমন একটা সংযোগ ব্যবস্থা, যা হবে মানুষের সাথী বা পার্টনার। 'স্মার্ট সংযোগ' সব ধরনের তথ্য পেতেও সহায়ক হবে।

এই অ্যাপে সরকারের সব ধরনের ডিজিটাল সেবা, পেমেন্ট সেবা ইত্যাদি সংযুক্ত থাকবে। ফলে নাগরিকরা মোবাইল ব্যবহার করে আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ সহজে করতে পারবেন। এরই মধ্যে সাথী'র একটি প্রাথমিক ইন্টারফেস তৈরি করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল পাচ্ছে সংবাদ মাধ্যম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল পাচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের বদৌলতে সংবাদ মাধ্যম এখন অনেক সমৃদ্ধ। প্রতিমন্ত্রী ১০ই নভেম্বর সিংড়া উপজেলা মিলনায়তনে সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখন প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন আছে, তাদের আছে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল। এটাকে

ব্যবহার করে যে-কোনো ফ্রিল্যান্সার কন্টেন্ট তৈরি করতে পারছেন, অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এক হাজার ৮০০ ফ্রিল্যান্সারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ফলে দেশের মিডিয়াগুলোর সম্প্রচারে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে, দেশের তথ্য ও উপাত্ত সুরক্ষিত থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজ হবে উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে, সেই স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজ হবে উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সহনশীল। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা হবে উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই। ১৯শে নভেম্বর 'স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়' সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (আইডিয়া) ফ্লোরে এটুআই-এর উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালের ১২ই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ এ চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। স্মার্ট বাংলাদেশের এ চারটি পিলার নির্ধারণ করে দিয়েছেন আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

জুনাইদ আহমেদ পলক আরও বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশে একজন স্মার্ট নাগরিক হবে বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক এবং সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী মানসিকতা সম্পন্ন। স্মার্ট অর্থনীতি হবে ক্যাশলেস, সার্কুলার, উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। স্মার্ট সরকার হবে নাগরিককেন্দ্রিক, আরও বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পের উন্নয়নে জামদানি ভিলেজ

দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শিল্পের উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জ জেলায় একটি জামদানি ভিলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য একটি প্রকল্প নিয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। জামদানি ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে আদর্শ গবেষণা ও নকশা উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। একইসঙ্গে থাকবে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া জামদানি ভিলেজ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড। বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ ধরা হয়েছে চলতি বছর থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। জামদানি ভিলেজটি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে স্থাপন করা হবে।

প্রকল্পে বলা হয়েছে, গবেষণা ও নকশা উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা, উৎপাদিত জামদানি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জামদানি পণ্যের ক্রেতা সাধারণের জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত এবং পরিবর্তিত বাজারে ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন। প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, অসাধারণ নকশায় সমৃদ্ধ জামদানি মূলত মসলিনেরই একটি ধরন, যা নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের বয়ন শিল্পীদের হাতে অনবদ্য শিল্পকর্মে রূপ নিয়েছে। ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৩ সালে জামদানি বয়ন শিল্পকে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ'-এর মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালে জামদানি পণ্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক সূচক হিসেবে পরিগণিত হয়, যা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

এইচএসসির ফলাফল হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২০২৩ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফল হস্তান্তর করা হয়। ২৬শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফলাফলের সারসংক্ষেপ হস্তান্তর করেন। এসময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ফলাফল পৌঁছে দেন।

ডা. দীপু মনি সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলন করে ফলাফলের বিস্তারিত ঘোষণা করেন। এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট ১৩,৫৯,৩৪২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৬,৮৮,৮৮৭ জন ছেলে এবং ৬,৭০,৪৫৫ জন মেয়ে ছিল।

শতবর্ষ বৃত্তি পেলেন ঢাবির ৩৯ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শতবর্ষ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি দেওয়া হয়। ২৮শে নভেম্বর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, এ জাতীয় বৃত্তি দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সফলতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তারা লেখাপড়ায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। দক্ষ গ্র্যাজুয়েট হিসেবে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে দেশ-জাতির উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্কুলে ভর্তির ডিজিটাল লটারির উদ্বোধন

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ডিজিটাল লটারি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ২৮শে নভেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এ লটারির উদ্বোধন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে তা অনলাইন দৈবচয়ন পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে এসময় জানানো হয়। লটারির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান। সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ।

এসময় জানানো হয়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ওয়েবসাইট এবং এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে পারবেন। ওয়েবসাইটে https://gsa.teletalk.com.bd/ -এ প্রবেশ করে এই ফলাফল দেখা যাবে। এসএমএসের মাধ্যমে ফল পেতে GSA লিখে স্পেস দিয়ে Result লিখে স্পেস দিয়ে User ID লিখে ১৬২২২ নম্বরে সেন্ড করতে হবে। ফিরতি এসএমএসে শিক্ষার্থী জেনে যাবে, সে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৪শে অক্টোবর আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত সময় থাকলেও পরে তা বাড়িয়ে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কেন্দ্রীয় লটারির অধীনে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি ৩ হাজার ৮৪৬ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলোতে শূন্য আসন ১১ লাখ ২২ হাজার ৯৪টি। বিপরীতে ভর্তির জন্য আবেদন জমা পড়ে ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৭৯২টি।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কারে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিযুক্ত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করেছে আইওএম এবং জাতিসংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা। ১লা ডিসেম্বর দুবাইতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৮-এর সাইডলাইনে একটি উচ্চ স্তরের প্যানেল অধিবেশনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন-আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপের কাছ থেকে তিনি এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কপ-২৮-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় 'অভিযোজন এবং সহনশীলতার জন্য জলবায়ু গতিশীলতাকে বাগে আনা' শীর্ষক উচ্চস্তরের এ প্যানেল অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ক্লাইমেট মোবিলিটি সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুজনিত কারণে বাধ্য হয়ে অভিবাসন এবং বাস্তুচ্যুতির দিকটি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন। একইসঙ্গে কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত ৪ হাজার ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বহুতল সামাজিক আবাসন প্রকল্প নির্মাণসহ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উদ্যোগের নানা দিক তুলে ধরেন তিনি ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং জলবায়ু গতিশীলতা এবং এ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ক্রমাগত নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বের এই সমর্থন।

উল্লখ্য, পুরস্কার প্রদানকারী গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থাটি জাতিসংঘ, আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন অর্থ সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় জলবায়ু গতিশীলতা মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক বিস্তৃত সমাধানের কাজে ব্যাপৃত।

অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার পেলেন আফরোজা পারভীন

'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪৩০' পেয়েছেন কথাসাহিত্যিক, গবেষক, শিশুসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কলাম লেখক আফরোজা পারভীন। জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ২৪শে নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আফরোজা পারভীনের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রে কথাসাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই বলেন, আফরোজা পারভীনের কথাসাহিত্যিক হিসেবে একটি বক্তব্য আছে সমাজ নিয়ে। আর সেই বক্তব্য প্রকাশ পায় তার ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের ভাষার মধ্য দিয়ে।

তথ্যচিত্রে কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক বলেন, বাংলা কথা সাহিত্যে শক্তিশালী নাম আফরোজা পারভীন। কথাসাহিত্যিক আন্দালিব রাশদী বলেন, আফরোজা পারভীনের লেখার মধ্য দিয়ে দৃশ্যপট আঁকতে পারেন। তার লেখা পাঠের সময় দৃশ্য আর চরিত্রগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলে মন্তব্য করেন।

আফরোজা পারভীন ১৯৫৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নড়াইল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি যুগ্মসচিব ছিলেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২৫টি। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি 'রক্তবীজ' নামে একটি ওয়েব পোর্টালের প্রকাশক ও সম্পাদক।

সাহিত্যে অবদান রাখায় তিনি ৩০টিরও অধিক পুরস্কার পেয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণে অবদান রাখায় পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় বেগম রোকেয়া পদক ২০২২।

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী নারীর তালিকায় বাংলাদেশের জান্নাতুল

বিবিসির করা এ বছরের বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ও অনুপ্রেরণাদায়ী নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের জান্নাতুল ফেরদৌস। ২১শে নভেম্বর এ তালিকা প্রকাশ করে বিবিসি।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মাতা, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী জান্নাতুল ফেরদৌসের শরীরের ৬০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। এরপরও তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ, লেখালেখি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি ভয়েস অ্যান্ড ভিউজ নামে একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৯৭ সালে রান্না করার সময় জান্নাতুলের ওড়নায় আগুন লাগে। শরীরের বেশির ভাগটা পুড়ে যায়। পুড়ে কুঁচকে বিকৃত হয় মুখ ও শরীরের একটা অংশ। এ পর্যন্ত চামড়া প্রতিস্থাপনসহ তার শরীরে প্রায় ৫০ বার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

খুলনায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা জান্নাতুল নিজের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে ২০১৫ সালে ভয়েস অ্যান্ড ভিউজ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক। এটি দগ্ধ নারীদের সচেতন করার পাশাপাশি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করছে। জান্নাতুল তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন তিনটি। তার লেখা ১১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

কক্সবাজার-ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচল শুরু

বহুল প্রতীক্ষিত কক্সবাজার-ঢাকা রুটে রেল চলাচল শুরু হয়েছে। ১লা ডিসেম্বর হাজারো যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে শুরু হয় ট্রেনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। স্বপ্নের প্রথম যাত্রা শুরু করতে আগেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। সহকারী স্টেশন মাস্টার আতিকুর রহমান জানান, বাণিজ্যিক যাত্রার প্রথম দিন ১লা ডিসেম্বর ঢাকার উদ্দেশে কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে যায় 'কক্সবাজার এক্সপ্রেস' ট্রেনটি। ১১টা থেকে টিকিট চেক করে যাত্রীদের বগিতে তোলা শুরু হয়। এসময় ফুল ও চকলেট দিয়ে অভিবাদন জানানো হয় যাত্রীদের। যাত্রাপথে এটি চট্টগ্রাম ও ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্টেশনে দাঁড়ানোর কথা রয়েছে।

সূত্রমতে, কয়েক দফা পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচলের সফল কার্যক্রম শেষে ১১ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজার রেল সংযোগ উদ্বোধন করেন। এসময় ডিসেম্বর থেকে ট্রেন চালুর নির্দেশনা দেন তিনি।

কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ফরহাদ বিন চৌধুরী বলেন, ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত শোভন চেয়ারের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৯৫ টাকা। এসি চেয়ারের ভাড়া ১ হাজার ৩২৫ টাকা, এসি সিটের ভাড়া ১ হাজার ৫৯০ টাকা ও এসি বার্থের ভাড়া (ঘুমিয়ে যাওয়ার আসন) ২ হাজার ৩৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত শোভন চেয়ারের ভাড়া ২০৫ টাকা, স্নিগ্ধা শ্রেণির ৩৮৬ টাকা, এসি সিটের ৪৬৬ ও এসি বার্থের ভাড়া ৬৯৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

মিরপুরের রূপনগর খাল দিয়ে তুরাগ নদী পর্যন্ত নৌপথ চালু হবে

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নৌপথ চালুর বিষয় উল্লেখ করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি মিরপুরের রূপনগর খাল দিয়ে তুরাগ নদী পর্যন্ত নৌপথ চালু করা হবে। ১০ই ডিসেম্বর ডিএনসিসির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায় খেলার মাঠ, পার্ক ও কবরস্থান পরিদর্শনে এসে তিনি এ কথা বলেন।

আতিকুল ইসলাম বলেন, রূপনগর খালে মোট ১১টি ব্রিজ রয়েছে সেগুলোকে আর্চ ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে এই পথে নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। এই শহরকে বাঁচাতে ন্যাচার বেইজড সলিউশন করতে হবে। নৌপথ চালুর মাধ্যমে যানজট যেমন কমবে সেই সাথে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি ইস্টার্ন হাউজিংকে বলেছি নকশা অনুযায়ী খেলার মাঠ, পার্ক ও কবরস্থান নির্মাণ করতে হবে। আজ পরিদর্শনে এসে দেখলাম, জনগণের জন্য একটি পার্ক, কবরস্থান ও খেলার মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

গোপালগঞ্জে নতুন পূর্ণাঙ্গ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পূর্ণাঙ্গ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাসমান কৃষি, জলমগ্ন কিঞ্চিৎ লবণাক্ত জমিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল আবাদের পাশাপাশি কৃষির বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ কেন্দ্রটি গবেষণার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ।

কৃষি মন্ত্রণালয় গোপালগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। ওই প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলা শহরের অদূরে ঘোনাপাড়ায় ২০ একর জমির ওপর ১৪৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয়ে গবেষণা কেন্দ্রটি নির্মাণকাজ ২০২০ সালে শুরু হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক ড. এম এম কামরুজ্জামান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষক হুমকির মধ্যে রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি বিভাগের ৫ জেলার ৩৮টি উপজেলার কৃষি উন্নয়নই এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, পূর্ণাঙ্গ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি কৃষির উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, গুণগতমান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, নতুন জাতের ফসলের উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা যাচাই, ফল, সবজি, ডাল, আলু, তৈল বীজ, গম, ভুট্টা, নারিকেল, তাল ও খেজুরের উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

পিরোজপুরে রবিশস্য মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা পাচ্ছেন কৃষকরা

সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পিরোজপুরে চলতি রবিশস্য মৌসুমে প্রণোদনা সহায়তা পাচ্ছেন কৃষকরা। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করেছে বলে ১৫ই নভেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পিরোজপুরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় থেকে জানা যায়।

চলতি অর্থবছরে জেলার ৭ উপজেলার ৫৩টি ইউনিয়ন ও ৪টি পৌর এলাকার ১১ হাজার ৯শত ৫০ জন কৃষক গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, মুগ, মসুর ও খেসারি চাষের জন্য এ প্রণোদনা সহায়তা পাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই পিরোজপুর জেলার কৃষকদের জন্য ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪৫০ টাকার বরাদ্দপত্র প্রদান করেছে এবং জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার কার্যালয় চাষিদের তালিকা চূড়ান্ত করছে। গম চাষের জন্য ৫০০ জন কৃষক প্রণোদনা পাচ্ছে। প্রতিজন ১ বিঘা চাষের জন্য এ প্রণোদনা পাবে। জনপ্রতি ২০ কেজি বীজ, ডিএপি সার ১০ কেজি, এমওপি সার ১০ কেজি বরাদ্দ রয়েছে। ১৩৫০ জন কৃষক ভুট্টা চাষের জন্য প্রত্যেকে প্রতি বিঘায় ২ কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাচ্ছে। ২৫৫ জন কৃষক সরিষা চাষের জন্য প্রতি বিঘায় ১ কেজি বীজ, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি ১০ কেজি, সূর্যমুখীর জন্য ৩ হাজার ৪শত জন কৃষক প্রতি বিঘায় ১ কেজি বীজ, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি ১০ কেজি, চিনাবাদাম চাষের জন্য ২৫০ জন কৃষক প্রতি বিঘায় ১০ কেজি বীজ, ডিএপি ১০ কেজি এবং এমওপি ৫ কেজি, সয়াবিন চাষের জন্য ১০০ জন কৃষক প্রতি বিঘায় ৮ কেজি বীজ, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি ১০ কেজি, মুগ চাষের জন্য ৫ হাজার কৃষক প্রতি বিঘায় ৫ কেজি বীজ, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি ৫ কেজি, মসুরের জন্য ৩৫০ জন কৃষক প্রতি বিঘায় ৫ কেজি বীজ, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি ৫ কেজি এবং বারি-১ ও ২ জাতের খেসারি চাষের জন্য ৭৫০ জন কৃষক প্রতি বিঘায় ৮ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ৫ কেজি এমওপি পাচ্ছে। কৃষকদের বীজ, সার প্রদানের জন্য পরিবহণ খরচ বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ৮ লক্ষ ৩ হাজার ৫৫০ টাকা।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে ৩০শে নভেম্বর শুরু হয় ২৮তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৮)। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয় আলোচনা করতে প্রতিবছর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘের এই শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলন চলে।

এবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিবসহ বাংলাদেশ থেকে শতাধিক পরিবেশকর্মী জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেন। সংশ্লিষ্টরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে লড়াই চলছে, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবারের মতো এবারের সম্মেলনেও বেশকিছু প্রত্যাশা থাকবে বিশ্ববাসীর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় বৈশ্বিক লড়াইয়ের প্রশ্নে কার্যকর উদ্যোগের অবতারণা ঘটবে বলেও প্রত্যাশা থাকবে। জলবায়ু অর্থায়ন (ক্লাইমেট ফান্ডিং) বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি স্থানান্তরের (জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বের হয়ে নবায়নযোগ্য উৎসের সন্ধান) বিষয়ও গুরুত্ব পাবে এ সম্মেলনে।

জলবায়ু অভিঘাতে প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি পরামর্শ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভবিষ্যৎ মানব সংকটের মুখোমুখি হওয়া থেকে তাদের রক্ষায় গতিশীলতার পাঁচটি বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া দরকার। এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে মানবিক সংকটে পরিণত না হয় সেজন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সংহতি প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী ২৮শে নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)-এর সদর দপ্তরে তিন দিনব্যাপী ১১৪তম অধিবেশনে 'মানব গতিশীলতার ওপর জলবায়ুর প্রভাব: সমাধানের জন্য বৈশ্বিক আহ্বান' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সম্প্রচারিত একটি ভিডিও বিবৃতিতে এ কথা বলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের চলাফেরায় যে প্রভাব পড়ছে তা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে প্রথমত, আমাদের নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসনের জন্য গ্লোবাল কমপ্যাক্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতিতে মানব গতিশীলতার ওপর জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জলবায়ু অভিবাসীদের অভিঘাত এবং ক্ষতির প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে বের করার জন্য জলবায়ু ন্যায্যতার আলোকে আমাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, অভিবাসনকে জলবায়ু অভিযোজন কৌশল হিসেবে দেখার জন্য আমাদের স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রস্তুত হতে হবে। চতুর্থত, জলবায়ু অভিবাসী, বিশেষ করে নারী,

শিশু এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সুরক্ষা মান পর্যালোচনা করতে হবে। পঞ্চমত, মানব গতিশীলতার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে আমাদের উন্নত গবেষণা ডেটা এবং প্রমাণের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন ঘর পেলেন আরও ৩৭টি পরিবার

'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহ ও ভূমিহীন থাকবে না'– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা বাস্তবায়নে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কার্যক্রমের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় সারা দেশের মতো ঝিনাইদহের মহেশপুরে ৫ম

পর্যায়ে ৩৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমি ও সেমিপাকা ঘর প্রদান করা হয়েছে। ১৪ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের শুভ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে মহেশপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ৩৭টি সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে জমির দলিল ও ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ময়জদ্দীন হামীদ, ভাইস চেয়ারম্যান আজিজুল হক আজা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হাসিনা খাতুন হেনা, মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শরীফ শাওন, নাটিমা ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাসেম, বাঁশবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা জিন্টু, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতের বড়ো উৎসবে জয়ার চার চলচ্চিত্র

ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত হলো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার (ইফি) ৫৪তম আসর। ২০শে নভেম্বর শুরু হওয়া উৎসবটি শেষ হয় ২৮শে নভেম্বর। উৎসবে বাংলাদেশের অভিনয়শিল্পী জয়া আহসানের চারটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত বছরের শেষ দিকে হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের খবর দিয়েছিলেন জয়া আহসান। সেই ছবি *কড়ক সিং* ইফির উদ্বোধনী দিনে ছবিটির ট্রেলার প্রকাশিত হয়। আর ২২শে নভেম্বর হয় প্রিমিয়ার। এর মধ্যে ছবির অভিনয়শিল্পীসহ লালগালিচায় হাঁটেন জয়া আহসান। অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত ছবিতে জয়ার সহশিল্পী বলিউডের পঙ্কজ ত্রিপাঠি ও সানজানা সাংঘি। এটি জয়ার প্রথম হিন্দি সিনেমা।

হিন্দি ভাষার *কড়ক সিং* ছাড়াও এবারের উৎসবে জয়ার তিনটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। *ফেরেশতে*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* ও *অর্ধাঙ্গিনী*। ভারতের সবচেয়ে বড়ো এ উৎসবে এর আগেও জয়ার ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। গত বছর *নকশিকাঁথার জমিন* খুব ভালো সাড়া ফেলেছিল। এ উৎসব অনেক গুরুত্ব বহন করে, কারণ, এটা ভারতের সবচেয়ে বড়ো চলচ্চিত্র উৎসব। বিশ্ব চলচ্চিত্র আঙিনায়ও এর গুরুত্ব রয়েছে।

স্মৃতিতে স্মরণে আলী যাকের

প্রখ্যাত অভিনেতা আলী যাকেরের জন্মদিন ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' আয়োজন করে 'স্মৃতিতে স্মরণে আলী যাকের' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান।

এই বরেণ্য ব্যক্তির ৬ই নভেম্বর জন্মদিন এবং ২৭শে নভেম্বর

ছিল তাঁর মৃত্যুদিন। ২৪শে নভেম্বর রাজধানীর বেইলি রোড বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আসাদুজ্জামান নূরসহ আরও বেশ কয়েকজন সম্মানিত অতিথি আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনাপর্ব শেষে তার অভিনীত বিভিন্ন নাটকের অংশবিশেষ মঞ্চস্থ হওয়ার পাশাপাশি তার প্রিয় গান-কবিতার অংশবিশেষও আবৃত্তি করা হয়।

শিল্পকলায় অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার আলী যাকেরকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদকে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী পদক, নরেন বিশ্বাস পদকেও ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে আলী যাকের আরণ্যক নাট্যদলের হয়ে মামুনুর রশীদের নির্দেশনায় মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকটিতে প্রথম অভিনয় করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আলী যাকের নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সভাপতি ছিলেন। গুণী এ অভিনেতা মঞ্চ ও টেলিভিশন দুই মাধ্যমেই দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

৮-০ গোলে জিতল বাংলাদেশ

র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের থেকে এগিয়ে সিঙ্গাপুরের নারী ফুটবলাররা। এত এগিয়ে থেকেও বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পেল না তারা। সিঙ্গাপুরের জালে এবার গুণে গুণে আটবার বল পাঠালেন সাবিনা-তহুরারা। ৪ঠা ডিসেম্বর কমলাপুরে বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ফিফা প্রীতি ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এতে করে সফরকারীদের সাথে দুই ম্যাচের সিরিজ জিতল ২-০ ব্যবধানে। এর আগে ১লা ডিসেম্বর সিরিজের প্রথমটিতে সিঙ্গাপুরকে ৩-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। সাফ শিরোপা জিতার পর এটি প্রথম জয় সাবিনাদের।

আট স্বর্ণ জয় বাংলাদেশের

আন্তর্জাতিক আসরে আবারো স্বপ্রতিভ বাংলাদেশের তায়কোয়ান্দোকারা। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম জিসিএস কলম্বো আন্তর্জাতিক তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশিপে ৮টি স্বর্ণ, একটি রুপা ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন লাল-সবুজের তায়কোয়ান্দোকারা। ৭ই ডিসেম্বর কলম্বোয় শেষ হওয়া দু'দিনব্যাপী টুর্নামেন্টের একক ইভেন্টে ৮টি স্বর্ণ জিতে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মেয়েদের স্মরণীয় জয়

বেনোনিতে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩রা ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের বিপক্ষে ১৩ রানের জয় পায় বাংলাদেশের মেয়েরা। ১১ বছর পর মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল বাংলাদেশ। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৫ উইকেট নেয় স্বর্ণা আক্তার। ২০ ওভারে বাংলাদেশ ২ উইকেটে করে ১৪৯ রান। জবাবে শক্ত অবস্থানে থেকে পথ হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা করতে পারে ৮ উইকেটে ১৩৬। ফলে ১৩ রানের সহজ জয় পায় বাংলাদেশ। এদিকে নিউজিল্যান্ডকে সিলেট টেস্টে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো বাংলাদেশ।

ইংল্যান্ডে লিটনের ব্রোঞ্জ জয়

দক্ষিণ এশীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল দেশের কুস্তি। অবশেষে সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বিদেশের মাটিতে আরেকটি সাফল্য কুড়িয়ে এনেছেন লাল-সবুজের জাতীয় কুস্তিগীর লিটন বিশ্বাস। ৩রা ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত জিবি ওপেন গ্র্যাঁ প্রিঁ চ্যাম্পিয়নশিপের ফ্রিস্টাইল অনূর্ধ্ব-২০ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেন বাংলাদেশের লিটন বিশ্বাস। স্পেনের কুস্তিগীরকে ৫-৩ পয়েন্টে হারিয়ে তিনি এই পদক জিতে নেন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক

আফরোজা রুমা

দেশের হৃদরোগ চিকিৎসায় অগ্রগণ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বার্ধক্যের কারণে ৫ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

আব্দুল মালিক ১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কুচাই ইউনিয়নের পশ্চিমভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম ফুরকান আলী, মাতার নাম মরহুমা সৈয়দ নুরুন্নেছা খাতুন। প্রাইমারি স্কুল শেষে ১৯৩৯ সালে সিলেট সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং সরকারি বৃত্তি পান। মেট্রিক পাসের পর সিলেট সরকারি এমসি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে আইএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে কেবল একটাই বোর্ড ছিল, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এই পরীক্ষায় তিনি ১১তম স্থান অর্জন করেন। আইএসসি পাসের পর ১৯৪৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে নভেম্বর মাসে মেডিকেল কলেজে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তাকে সিএমএইচ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল) পেশোয়ারে কর্নেল আজমিরের কাছে মেডিকেল স্পেশালিস্টের যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এতে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে সরকার তাকে বিলেতে পাঠায় উচ্চ শিক্ষার জন্য। ১৯৬৪ সালে তিনি এমআরসিপি পাস করেন। তিনি হ্যামার স্মিথ হসপিটাল অ্যান্ড পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিকেল স্কুল, লন্ডন থেকে কার্ডিওলজিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সালে আব্দুল মালিক পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোরে যোগদান করেন। তিনি মিলিটারি হাসপাতাল, রাওয়ালপিন্ডিতে কার্ডিয়াক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে আইপিজি এমআর, ঢাকা (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)-এ যোগদান করেন। ১৯৭০-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি আইপিজিএমআর– এ কার্ডিওলজির ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৮০-২০০০ সাল পর্যন্ত WHO-এ Cardiovascular Disease Expert Panal Committee- তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০১ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি যেসব পদে এবং দায়িত্বে আসীন ছিলেন– প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্ট, অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল, বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি, চেয়ারম্যান, একাডেমিক কাউন্সিল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট, উপদেষ্টা (অনারারি) ন্যাশনাল সেন্টার ফর কন্ট্রোল অব রিউমেটিক ফিভার অ্যান্ড হার্ট ডিজিজেস, উপদেষ্টা হাইপারটেনশন কমিটি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, সদস্য, ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট।

তিনি 'জীবনের কিছু কথা' এবং 'আলোর পথ' নামে দুইটি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।

আব্দুল মালিক ২০০৪ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ২০০৬ সালে সরকার তাকে জাতীয় অধ্যাপক মনোনীত করে। ২০০৮ সালে সান্ডোজ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। অধ্যাপক আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সিলেটের পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ে পারিবারিক কবরস্থানে ৬ই ডিসেম্বর তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 06, December 2023, Tk. 25.00

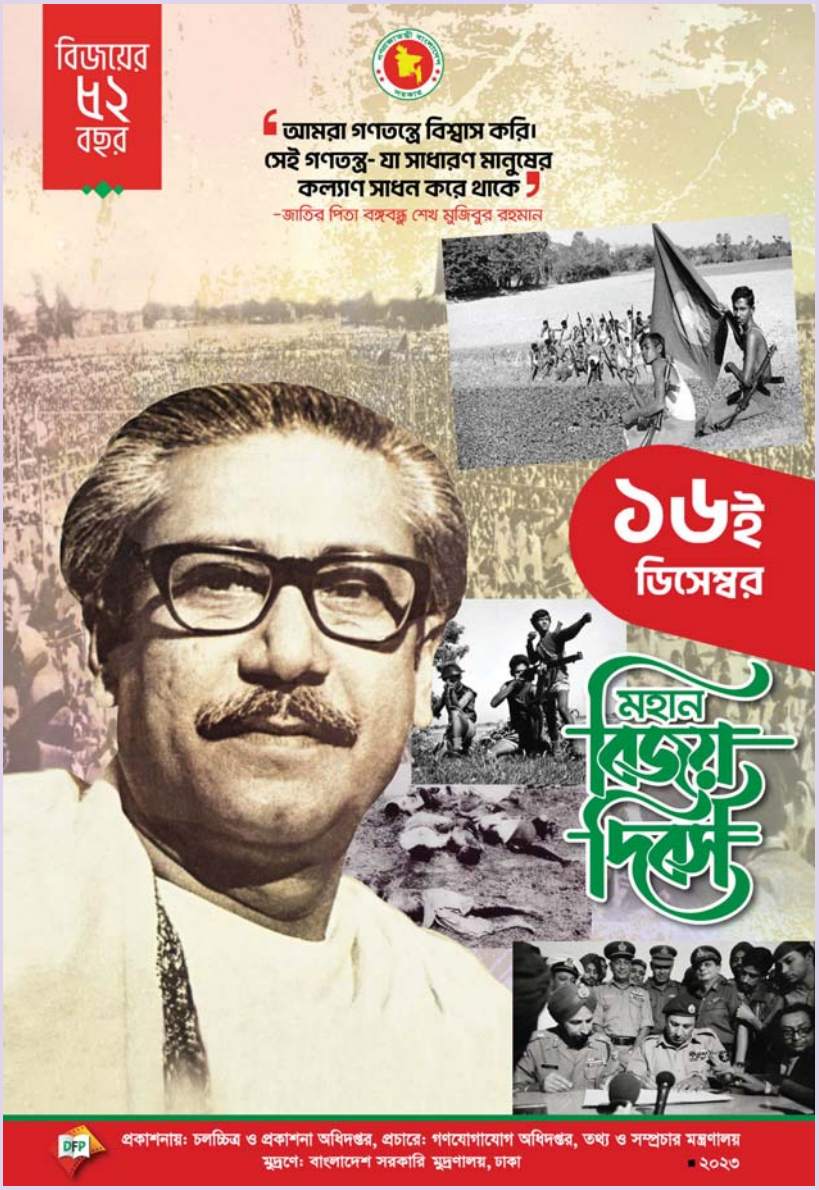

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd